ভাদ্র
১৪২৯

কৃষিবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন

কৃষিকথা

১৫
আগস্ট
জাতীয়
শোক
দিবস

আমরা শোকাহত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd

কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd

কৃষিবিষয়ক ত্রৈমাসিক
কৃষিকথা

৮২তম বর্ষ ◻ ৫ম সংখ্যা ◻ ভাদ্র-১৪২৯ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২২)

সম্পাদকীয়

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ড. সুরজিত সাহা রায়
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

সম্পাদক
কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম

সহযোগিতায়
মোছা: সাবিহা সুলতানা

প্রচ্ছদ
শিল্পী নূর ইসলাম
হুমায়রা আক্তার

কম্পিউটার কম্পোজ
মো: সফিউল্যাহ
আশরাফুন নাহার

যোগাযোগ
সম্পাদনা শাখা : ৫৫০২৮৪০৪
তথ্য শাখা : ৫৫০২৮৪৪১
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা

ই-মেইল
editor@ais.gov.bd
dirais@ais.gov.bd

ওয়েবসাইট
www.ais.gov.bd

আগস্ট বাঙালি জাতির শোকের মাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ দেশের অবিসংবাদিত নেতা। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা। দুঃখী দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। স্বাধীন দেশে তিনি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, বৈষম্যহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি মানবতার শত্রু, প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের দল। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। শোকের মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকীতে জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং গভীরভাবে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করলেও তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের বিনাশ নেই। শত্রুদের নীল-নকশাকে নস্যাৎ করে শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, কৃষকরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর পদাংক অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতাসহ একটি সুখীসমৃদ্ধ আধুনিক দেশ গড়তে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিমন্ত্রী সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন। দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে। যেকোন বৈরী পরিস্থিতিতে দেশের কৃষি খাত ও কৃষকের কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদান করছেন। এ ছাড়াও কৃষির আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও স্মার্ট কৃষিতে পরিণত করতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলছে কৃষি মন্ত্রণালয়। আর বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

এ সংখ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকীতে শোক শক্তির হাতিয়ারে কৃষির জয়যাত্রা উল্লেখপূর্বক সময়োপযোগী তথ্য ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো হয়েছে কৃষিকথা। এসব লেখার বিষয়বস্তু তথ্য উপাত্ত ও মতামত লেখকের নিজস্ব। যারা লেখা দিয়ে কৃষিকথা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আশা করি কৃষিকথা জাতির পিতার স্বপ্ন সোনালি ফসলের ভরপুর বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশ সমৃদ্ধ হবে।

কৃষিকথা

৮২তম বর্ষ ❑ ৫ম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-১৪২৯ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২২)

সূচিপত্র

নিবন্ধ

- শোক থেকে শক্তিতে কৃষির জয়যাত্রা — ৩
  মোঃ সায়েদুল ইসলাম
- বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্থশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন — ৬
  ড. জাহাঙ্গীর আলম
- টিসু কালচার চারায় জি-৯ কলা চাষ — ১০
  মৃত্যুঞ্জয় রায়
- মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিল : উপকূলের কৃষকদের জন্য একটি আশীর্বাদ — ১২
  ড. এম জি নিয়োগী
- বাউ-মানকচু ১ উৎপাদন প্রযুক্তি ও পুষ্টিগুণ — ১৪
  ড. এম এ রহিম, ড. সুফিয়া বেগম ও মো. আবু জাফর আল মুনছুর
- বিপন্ন প্রজাতির মহাশোল মাছ : প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা — ১৫
  ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
- আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা — ১৭
  কৃষিবিদ ডক্টর এস এম রাজিউর রহমান
- পুষ্টিগুণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় তালগাছ — ২০
  কৃষিবিদ মোহাম্মদ সাইফুল আলম সরকার

আগামীর কৃষি ভাবনা

- খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির স্বার্থে মিলিং ব্যবস্থাপনার জনসচেতনতা — ২২
  মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার
- তুলা চাষে অনন্য সুবিধা ও সম্ভাবনা — ২৪
  অসীম চন্দ্র শিকদার

সফল কৃষকের গল্প

- রকমেলন চাষে সফলতা পেয়েছেন রূপসার ক্ষিতিষ বৈরাগী — ২৬
  মোঃ আবদুর রহমান

কবিতা

- একজন বাবার গল্প — ২৮
  কৃষিবিদ স্বপন বিশ্বাস

নিয়মিত বিভাগ

- ভাদ্র মাসের তথ্য ও প্রযুক্তি পাতা — ২৯
  কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন
- প্রশ্নোত্তর — ৩০
  কৃষিবিদ মোঃ আবু জাফর আল মুনছুর
- আশ্বিন মাসের কৃষি — ৩১
  কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম

শোক থেকে শক্তিতে কৃষির জয়যাত্রা

মোঃ সায়েদুল ইসলাম

১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির শোকের দিন। শ্রাবণের ধারার সাথে মিতালি করে বাংলার আকাশ বাতাস প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল এদিনে। কি নিদারুণ কষ্ট, কি সীমাহীন লজ্জা, কি অপরিসীম যাতনার একটি দিন বাংলাদেশ দেখেছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ভোর বেলা শুদ্ধ বাতাসে যখন প্রকৃতি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে সেই স্নিগ্ধতাকে ছাপিয়ে রক্তের তাজা গন্ধে কলুষিত হয়েছিল আগস্টের সেই সকাল। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি পরিবার শুধু পরিবারই নয় সেটি ছিল পুরো বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন বাংলাদেশ বাঁচবে ততদিন অমর থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, একজন মহামানব তথা মহান আদর্শের নাম। এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন উপনিবেশিক শাসক শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার সাহসী আপামর জনতা বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কিন্তু কে জানত এই স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষের ভিড়ে অমানুষের আস্তানা গড়ে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তি তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের চক্রান্তকে বাস্তবরূপ দিয়েছিল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি যেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুতিকাগার নামে পরিচিত সেখানেই গভীর রাতে হামলা চালায় তারা। বিশ্ব ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই নয়, তার সাথে বাঙালির হাজার বছরের প্রত্যাশার অর্জন স্বাধীনতার আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে শহীদ হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবার পরিজনসহ ২৬ জন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে তারা প্রাণে বেঁচে যান। সে সময় তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন বাংলাদেশ বাঁচবে ততদিন অমর থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, একজন মহামানব তথা মহান আদর্শের নাম। এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। শুধু তাই নয় গোটা বাঙালি জাতি শোকে মুহ্যমান হলেও ভয়ঙ্কর ওই হত্যাকাণ্ডে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে দীর্ঘ সময় তাদের আড়াল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি খুনিরা পুরস্কৃত ও পুনর্বাসিত করা হয়েছে নানানভাবে। হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করেছিল বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোশতাকের সরকার।

কি না করেছিলেন বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের জন্য। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার কৃষিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তিনি খাসজমিসহ ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য পরিবার প্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দেন। তিনি উন্নত বীজ, সার, সেচের নানারকম পাম্প ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি সারের নিম্নমূল্য নির্ধারণ করেন এবং কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করেন। পাকিস্তানি আমলে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের রক্ষা করেন। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করে দেন। সরকার

ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় স্থাপন করেন এবং সেলামি ছাড়া জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবকাঠামো পুনর্গঠনের সাথে সাথে তিনি কৃষি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে সর্বাধিক মনোযোগ দেন। প্রথম বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে তিনি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন শুধু কৃষি খাতের জন্য।

বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্কার, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে স্থানীয়ভাবে তুলার উৎপাদনের গুরুত্ব অনুভূত হয়েছিল। এ সময় আমাদের বস্ত্র শিল্পগুলো কাঁচামালের অভাবে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এ অবস্থায় ১৯৭২ সালে দেশে তুলার চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন হয়। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয়, বঙ্গবন্ধু তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এ দেশে কৃষি গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বয়ধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই ১৯৭৩ সালেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে নতুন নামে পুনর্গঠন ও বিস্তৃতি ঘটান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের। তখনই ঢাকার আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে 'কৃষি পারমাণবিক গবেষণা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (ইনা) প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন, যা ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) হিসেবে বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তর হয়। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) এসবের অবদান সর্বজনবাদিত। পুনর্গঠন করা হয় হর্টিকালচার বোর্ড, সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি ও রাবার উন্নয়ন কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধু বিএডিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে কৃষির প্রধান উপকরণ সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং বীজ ও সার সরবরাহের প্রচলন করেন। ইরি বীজ সরবরাহে এ প্রতিষ্ঠান একক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলার সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাটের উপর গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্ব

বিবেচনায় স্বাধীনতাত্তোর প্রাক্তন জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের কৃষিতে এক দীর্ঘমেয়াদি ও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট যেখানে সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণির মর্যাদায় যোগদান করতেন, সেখানে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের সরকারি চাকরিতে তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদায় যোগদান করতে হতো। একই দেশে টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কর্মক্ষেত্রে এক জটিল ও বহুমাত্রিক টানাপড়েন সৃষ্টি করেছিল। কৃষিশিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণসহ কৃষির সর্বক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল। পাকিস্তান সরকার আমাদের কৃষির উন্নতি হোক, সে বিষয়ে ভীষণ রকম উদাসীন ছিল। সে কারণে বিভিন্ন প্রকার টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাছাড়া কৃষিকে তারা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের যদি কৃষিশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা না যায়, তাহলে কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়। অতঃপর সবদিক বিবেচনা করেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সরকারি চাকরিতে অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের

মতো কৃষি গ্র্যাজুয়েটদেরও প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দেন।

কৃষিকাজে কৃষকদের ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ ও কৃষি উৎপাদনের উৎসাহ দানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৯/১৯৭৩ এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে নতুন নতুন অর্জন, কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর নীতি ছিল কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রোল মডেলে পরিণত করা। শত সহস্র বাধা বিপত্তি পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ কৃষি ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে কৃষি খাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে বাংলাদেশ আজ রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় এবং ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দু'বার ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়। বাংলাদেশ এখন মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার কমানো, প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধি, খাবারের গুণগত মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ মানদণ্ডে বিশ্বে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যার মূলে রয়েছে কৃষির রূপান্তর।

সরকারের কৃষকবান্ধব নীতি ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের কারণে খোরপোশের কৃষি ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈরী প্রকৃতির প্রভাবে ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদির বিপরীতে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সরকার রাসায়নিক সারের দাম দফায় দফায় কমিয়ে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছে। চার দফায় সারের মূল্য কমিয়ে ইউরিয়া সারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি ১৬ টাকা, এমওপি সারের ৭০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫ টাকা, ডিএপি সারের দাম ৯০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পাঁচ দফায় দেশে ইউরিয়া সারের দাম প্রতি কেজি ১৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২২ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারের ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৭ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে সারের ভর্তুকি দেয়া হয়েছে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৫০-৭০% ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কৃষি যন্ত্রপাতি। মোট বাজেটের প্রায় ২ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে ভর্তুকি খাতে। এছাড়া কৃষি খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও খরাসহিষ্ণু জাতের উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকার সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচের যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষি সম্প্রসারণ, ন্যায্যমূল্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা, খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধাদি নিশ্চিত করাসহ নানাবিধ কৃষিবান্ধব কর্মযজ্ঞে কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পাশাপাশি সবজি, ফল, ফুলসহ নানারকম কৃষি পণ্য উৎপাদিত ও বাজারজাত করা হচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে টিসুকালচার প্রযুক্তি ও উত্তম কৃষিচর্চা মেনে ফসল উৎপাদন, রপ্তানি উপযোগী জাতের ব্যবহার, আধুনিক প্যাকিং হাউজ নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ নানান কাজ চলমান রয়েছে। সবজির উচ্চফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত উৎপাদন ২০ দশমিক ৯ শতাংশ বৃদ্ধি বেড়েছে। সবজির পাশাপাশি খেজুর, বড়ই, মাল্টা, ড্রাগন, অ্যাভোক্যাডো, স্ট্রবেরি, বাউকুল, আপেলকুলসহ নানাবিধ বর্ণিল ও বৈচিত্র্যের ফল আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ১৫ বছর ধরে আমাদের দেশে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ হারে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ১১৮টি দেশে সবজি রপ্তানি করছে। কৃষি পণ্য রপ্তানিতে ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে। সরকারের লক্ষ্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষিকে টেকসই ও লাভজনক কৃষিতে রূপান্তর করা। কাজুবাদাম, কফি প্রভৃতি অর্থকরী ফসল নিরাপদভাবে দেশের মাটিতে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষিকে উন্নত ও আধুনিক করা। তাছাড়াও আগামী তিন বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদার চল্লিশ ভাগ স্থানীয়ভাবে পূরণ করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের স্লোগান 'শোক থেকে শক্তি, শোক থেকে জাগরণ' তা যেন আজ কৃষির উন্নয়নের ধারায় প্রতিফলিত হচ্ছে। আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বাংলাদেশ যে শোকের সাগরে ভেসেছে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্নপূরণে আজ তাই ততটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে পুরো জাতি। বাংলাদেশ এক অপার বিস্ময়ের দেশ। বাংলাদেশ অযুত সম্ভাবনার দেশ। বঙ্গবন্ধুর কৃষিনীতির পথ ধরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ খাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কৃষি খাতের উন্নয়ন ও কৃষকদের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮, টেকসই অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরসংস্থা সকলে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সোনাফলা মাটি, সমৃদ্ধ ও উন্নত কৃষি ও সোনার মানুষ সমন্বয়ে এগিয়ে চলুক সুখী সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। আসুন দেশকে এগিয়ে নিতে আমরা সকলে হই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

লেখক : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moa.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্ধশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন

> সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে

ড. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতার ৫০তম বছর অতিক্রম করেছে। একই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এর ফলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমাদের জাতির পিতা গ্রাম থেকে এসেছেন, গ্রামের কৃষকদের সংস্পর্শে থেকে তাদের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। বলেছেন, 'আমিতো গ্রামেরই ছেলে। গ্রামকে আমি ভালোবাসি।' স্বাধীনতার পর ওই গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তিনি উদার রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন এ দেশের কৃষি ও কৃষকের এক মহান প্রাণ-পুরুষ, পরম বন্ধু। দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের কথা ভেবে তিনি ডাক দিয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের। এর মাধ্যমে তিনি কৃষির উৎপাদন বাড়াতে চেয়েছেন। সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি আর্থিক সমস্যার সমাধানসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা, সু-আচরণ ও আত্মসহায়তাবোধ নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যম একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।' বঙ্গবন্ধু আরও বলেছেন, 'আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়- মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে'।

বঙ্গবন্ধু সমবায় আন্দোলনকে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। একে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমেই তিনি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং দেশের জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি।'

স্বাধীনতার পূর্বে ষাটের দশকে এ দেশে সমবায় আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। সমিতির সংখ্যা ছিল হাতে গুণা। সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহায়তায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি সমবায় প্রসারিত হচ্ছিল দেশের সীমিত কিছু এলাকায়। পানি সেচ ও উচ্চফলনশীল ফসলের আবাদ উৎসাহিত করা হচ্ছিল বিভিন্ন গ্রামে। সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। তখন দেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে এসবের প্রভাব ছিল খুবই কম। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে। (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা'।

বঙ্গবন্ধু দেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সদস্য হতো গ্রামের সব মানুষ। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যৌথ কৃষি খামার। সরকার তাতে ঋণ দেবে, উপকরণ সহায়তা দেবে, সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তার সুফল পাবে জমির মালিক, শ্রম প্রদানকারী ভূমিহীন কৃষক ও সরকার। তবে জমির মালিকানা কৃষকেরই থাকবে। এ ক্ষেত্রে ভয় না পাওয়ার জন্য কৃষকদের তিনি আশ্বস্ত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে পাঁচ বছরের প্ল্যান, প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ...ভুল করবেন না। এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে আমি আপনাদের জমি নেবো না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব, তা নয়। এ জমি মালিকের থাকবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন। কিন্তু ফসলের অংশ সবাই পাবে। ...এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে, আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল দেশদ্রোহী সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর গ্রামভিত্তিক বহুমুখী

সমবায়ের রূপরেখা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু সমবায় আন্দোলন থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণায় সমবায় কর্মসূচি পুণরায় গতি লাভ করে। বর্তমানে এ দেশে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯৭,০৬৫টি। তাতে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১,১৭,৪২,৬৭৪ জন। এদের একটি বড় অংশ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষি পণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রায়নের ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বিপণনে উৎসাহিত করেছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রতি বছর গড়ে ৩.০৯ শতাংশ হারে এবং সদস্য সংখ্যা ২.৮২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানত ও কার্যকরী মূলধনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৭০ এবং ৯.৭১ শতাংশ (সারণি-১)। বর্তমানে সমবায় খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে ৯,৬৩,৮৯২ জনের। এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সূচিত হয়েছে দেশের সমবায় খাতে।

সারণি-১ : বাংলাদেশে সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান এবং অর্ধশতাব্দীর প্রবৃদ্ধির হার

বিবরণ	১৯৭২ সাল	২০২১ সাল	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার
সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪২,০২৫	১.৯৭,০৬৫	৩.০৯
সদস্য সংখ্যা	২৮,৬৫,৫৭৩	১,১৭,৪২,৬৭৪	২.৮২
আমানত (টাকা)	৩৩,০৩,৫১,২৮৭	৯৪,২৬,২৯০ (লক্ষ)	৬.৭০
কার্যকরী মূলধন (টাকা)	১১৯,০১,৭০,০৫৯	১৫২৯৪৮৮.০২ (লক্ষ)	৯.৭১

গত ৫০ বছরে দেশে কৃষির উৎপাদন প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দুধ, ডিম, মাংস ও মাছের উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ম্ভর। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি হেক্টর ১ টন থেকে ৩ টনে। উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে। সেচ এলাকা বিস্তার লাভ করেছে ৭৪ শতাংশ ফসলি এলাকায়। এতে সমবায়ের প্রভাব রয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কৃষি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এর জন্য সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি গ্রামে যৌথ কৃষি খামার গড়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। এর বণ্টন ব্যবস্থা হতো তেভাগা পদ্ধতির। ভাগ পাবে জমির মালিক, শ্রমিক ও সমবায়। এ বিষয়ে ৭০ এর দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু মাঠ পর্যায়ের গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মনসিংহের শিমলা, কুমিল্লার বামইল, রাজশাহীর গুরুদাসপুর এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া গুমাইবিল প্রকল্প। গবেষণায় দেখা গেছে ফলাফল ইতিবাচক। তাতে উৎপাদন বেড়েছে। শ্রমিক তার মজুরি পেয়েছে বেশি। গ্রামীণ আয়ের বণ্টনে উন্নতি হয়েছে। বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে যৌথ খামার কর্মসূচি আর এগিয়ে যেতে পারেনি। তবে সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ গ্রাম উন্নয়ন তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য তা আজও প্রাসঙ্গিক। সম্প্রতি সমবায় বিভাগ প্রণীত বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রকল্প তা মাঠপর্যায়ে প্রতিপাদন করতে পারে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলারের নিচে। অর্ধশতাব্দী পর এখন তা উন্নীত হয়েছে ২,৫৯১ মার্কিন ডলারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত ১৩ বছর ধরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ হারে। ১৯৭২ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশ। একটি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে স্থান করে নিয়েছে। তবে আয় বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বরং তার অবনতি ঘটেছে। ২০২০ সালে আয় বণ্টনের গিনি সহগ ছিল শূন্য দশমিক ৪৫, সেটি ২০১৮ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৮। এটা মাঝারি বা পরিমিত পর্যায়ের আয়বৈষম্য হিসেবে বিবেচ্য। গিনি সহগ ০.৫ এর উপরে গেলে তা হবে উচ্চ আয় বৈষম্যের নির্দেশক। আমরা সেই ক্রান্তিকালে আছি। অতএব, এ বৈষম্য কমাতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে আয়বৈষম্য দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি সমবায়কে যত্নবান হতে হবে।

বর্তমানে মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাজমান। বৈষম্য রয়েছে গ্রাম ও শহরের জীবন ধারায়। এগুলো দূর করতে হবে। এর জন্য দরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা, পুঁজি গঠন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা, বাসস্থানের সংস্থান বাড়ানো ইত্যাদি। সমবায়ের মাধ্যমে তা কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। রূপকল্প ২০২১ এর প্রধান লক্ষ্যগুলো ছিল উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে আমরা পুরোপুরি সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে

রূপকল্প ২০৪১ অনুসারে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। তখন জনপ্রতি আয় দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হবে। চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। দেশের নাগরিকদের কোন অভাব থাকবে না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে সমবায়। অতএব রূপকল্প ২০৪১ এর বাস্তব রূপায়ন ও আয়বৈষম্য হ্রাসের জন্য সমবায়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

বাংলাদেশের ক্ষেতে-খামারে দ্রুত উৎপাদন বাড়ছে। তাতে সমস্যা বাড়ছে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। বিপণন প্রক্রিয়ায় লাভবান হচ্ছে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী

কৃষক গ্রুপ বা সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন

ফরিয়া ও ব্যবসায়ী। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের উৎপাদন মৌসুমে ধানের মূল্য থাকে প্রতি মণ ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। পরে তা ১১০০ থেকে ১২০০ টাকায় বৃদ্ধি পায়, তখন কৃষকের ঘরে আর বিক্রিযোগ্য ধান থাকে না। এর লাভ পুরোটাই নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যবসায়ী, চালের আড়তদার ও চাতালের মালিকরা। তাছাড়া বেগুন উৎপাদন করে শেরপুরের কামারের চরের কৃষকরা প্রতি কেজি বিক্রি করে ৮ থেকে ৯ টাকায়। ঢাকায় তা খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হয় ৫০ টাকায়। দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি লিটার দুধ বিক্রি হয় ৪০ টাকায়। ঢাকায় তা কিনতে হয় ৮০ থেকে ৯০ টাকা দরে। সিরাজগঞ্জের বাঘা বাড়িতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে মিল্ক ভিটার মাধ্যমে দুগ্ধ বাজারজাত করণের সুবিধা থাকার জন্য। সুনামগঞ্জের হাওরে সেই সুবিধা নেই, দুধের উৎপাদনেও তেমন লক্ষণীয় কোন উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কাজেই দেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য লাভজনক বিপণন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমবায়ের মাধ্যমে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক বিপণনের বহু উদাহরণ আছে। ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, ভারত সবত্র সমবায়ভিত্তিক বিপণনের প্রাধান্য রয়েছে। নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্কে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কৃষিজাত পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশে এর অবস্থান দুর্বল। এ ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়ন এবং সমবায়ভিত্তিক বিপণন ও উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি অগ্রগামী দেশ। বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষা, গবেষণা, রাজনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্র, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সমবায় সমিতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম। বাংলাদেশে মোট সমবায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৩ হাজার। এর মধ্যে ২৩/২৪ শতাংশ নারী। এটা বাড়াতে হবে। দেশের অনেক অনানুষ্ঠানিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হিস্যা ৭০/৮০ শতাংশ। অনুষ্ঠানিক সমবায়ের ক্ষেত্রেও তা অনুসরণযোগ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন"। সমবায়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

চিরায়ত সমবায়ের সবচেয়ে বড় সাফল্য ক্ষুদ্র ঋণ উদ্ভাবন। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ দেশে চালু রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১। সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এরা নিজেরা সঞ্চয় করে, ঋণও দেয়। চীনে শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষি ঋণ সমবায়ভিত্তিক। বাংলাদেশেও এর সম্প্রসারণ ঘটছে। তবে বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। এর প্রতিকারও আছে। গণতন্ত্রায়ন ও স্বচ্ছতা সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে দুর্নীতি থাকবে না।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অভিযাত্রী। এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন সমবায়। আমাদের দেশের সমবায় চিন্তকদের অবশ্যই ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। এটি শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন সমবায়। এটি সততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় 'দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ। মোবাইল : ০১৭১৪২০৪৯১০, ই-মেইল : almj52@gmail.com

টিসু কালচার চারায় জি-৯ কলা চাষ

মৃত্যুঞ্জয় রায়

'গ্র্যান্ড নাইন' (জি৯) এক ধরনের সাগর কলার মতোই উন্নত জাতের কলা যা সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্র্যান্ড নাইন একটি ক্যাভেন্ডিজাতীয় কলা যার প্রজাতি *Musa acuminata*. চিকিতা ব্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালের একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক জাতের কলার কারণে একে অনেকে 'চিকিতা ব্যানানা' নামেও ডাকেন। ফরাসী ভাষায় 'Grand Nain' বা 'Grand Naine' কলার আভিধানিক অর্থ Large Dwarf বা বৃহৎ বামন। এর গাছ জায়ান্ট ক্যাভেন্ডিশ জাতের চেয়ে খাটো, কিন্তু ডোয়ার্ফ ক্যাভেন্ডিশ জাতের গাছের চেয়ে লম্বা।

ভারতে ইসরায়েল থেকে ১৯৯৫ সালে জি-৯ কলা আনা হয়, সে দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ লাখ জি-৯ টিসু কালচার চারা উৎপাদিত ও রোপিত হয় যা মোট কলাচাষের প্রায় ১৭%।

বাংলাদেশে এ জাতের কলার চাষ শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে জি-৯ কলার টিসুকালচার চারার উৎপাদন ও বিক্রি করা হচ্ছে। উচ্চফলন ও অধিক সংরক্ষণকালের কারণে অনেকেই এখন জি- ৯ জাতের কলা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ জাতের কলার চারা উৎপাদিত হয় টিসু কালচারের মাধ্যমে। সনাতন প্রথায় প্রচলিত জাতের কলা চাষ করতে গেলে রোগমুক্ত চারা সহজে মেলে না। কিন্তু টিসু কালচারের চারা সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় কোনো কোনো ঘেরের পাড়ে স্থানীয় আইট্যা কলা, ঠুটে বা বাংলা কলা, কাচা কলা ইত্যাদি জাতের কলা চাষ করা হয়। এসব স্থানীয় জাতের কলাগাছ লম্বা, বছরে একবার কলা ধরে ও ফলন কম হয়। অনেক সময় গাছ লম্বা হওয়ায় ঝড়-বাতাসে ভেঙে পড়ে। অথচ জি- ৯ জাতের কলায় এসব অসুবিধা নেই। তাই ঘেরের পাড়ে এ জাতের কলা চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যেতে পারে। সারা দেশে মাঠেও এককভাবে বাগান আকারে বাণিজ্যিকভাবে জি-৯ কলার চাষ করা যায়। এক একর এ জাতের কলা চাষে প্রায় ৩ লাখ টাকা লাভ হয়।

জি- ৯ কলার বৈশিষ্ট্য

এ জাতের কলার ফলন বেশি, সুস্বাদু ও রোগ প্রতিরোধী। একটি গাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি বা ২২০-২৪০টি কলা পাওয়া যায়, সেখানে প্রচলিত জাতের কলা পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ৬০-১২০টি। দুই বছরে তিনবার ফল পাওয়া যায়। গাছ মাঝারি আকারের (২ মিটার লম্বা) ও শক্ত হওয়ায় ঝড়-বাতাসে সহজে ভেঙে পড়ে না। এমনকি এ জাতের কলা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহনশীল। গাছ থেকে কলা পাড়ার পর তুলনামূলকভাবে এই কলা বেশি দিন টিকে থাকে বা নষ্ট হয় না। কাঁদির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো কলার আকার এক রকম হয়। পাকা কলার রং আকর্ষণীয় হলুদ, লম্বা ও কম বাঁকানো, কলার গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। এসব কারণে বিশ্বব্যাপী 'জি- ৯' জাতের কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

টিসু কালচার চারা উৎপাদন

(ক) ল্যাবরেটরিতে টিসু কালচার চারা উৎপাদন : সারা বিশ্বে জি-৯ জাতের কলা সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয়। চাষকৃত এ জাতের কলার বিপুল পরিমাণ চারা টিসু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। টিসু কালচার বা কোষকলা আবাদ উদ্ভিদ

বংশবিস্তারের একটি পদ্ধতি, যেখানে বীজের পরিবর্তে কোনো উদ্ভিদের এক বা একাধিক কোষগুচ্ছ থেকে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে আবাদ মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়। কলাগাছের কন্দ বা কর্ম, সাকার বা তেউড়, অসি তেউড় বা সোর্ড সাকার সাধারণত রোপণ দ্রব্য হিসেবে লাগানো হয়। এর বদলে গাছের কোষ বা টিসু ব্যবহার করা হয় চারা উৎপাদনের জন্য। সুস্থ, নীরোগ ও উন্নতমানের পরীক্ষিত মাতৃকলাগাছের কোষ বা মেরিস্টেম নিয়ে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টেস্ট টিউবের মধ্যে কলার টিসু কালচার চারা উৎপাদন করা হয়। এভাবে হাজার হাজার চারা ল্যাবরেটরিতে ঘরের মধ্যে উৎপাদন করা যায়। টেস্ট টিউবে উৎপাদিত ছোট চারাকে পরে পলিব্যাগে লালনপালন করে বড় করা হয়।

(খ) ঘরোয়া পরিবেশে টিসু কালচার চারা উৎপাদন : ল্যাবরেটরিতে টিসু কালচার চারা উৎপাদন করা ব্যয়সাধ্য ও অনেক কারিগরি বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হয়। কিন্তু যে কেউ চাইলে নিজের বাড়িতেও টিসু কালচার চারা উৎপাদন করতে পারেন। অবশ্যই সেসব চারা কখনোই ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত চারার মতো শতভাগ রোগমুক্ত হবে না, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের চেয়ে অনেক ভালো এবং একটি গাছ থেকে অনেকগুলো চারা উৎপাদন করা যায়।

এ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করতে হলে জি-৯ জাতের কলাগাছের ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছ কেটে তার গোড়া বা মোথা তুলে নিয়ে আসতে হবে। এরপর মোথার শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে মোথা পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। মোথা থেকে যতগুলো চোখ আছে সেগুলো ধারাল চাকু দিয়ে চৌকা ব্লক করে তুলতে হবে। চোখের আকার অনুযায়ী প্রতিটি ব্লকের আকার ৪-৫ সেন্টিমিটার হতে পারে। বাড বা চোখগুলো ৫ লিটার পানিতে ১ চা-চামচ গুঁড়া সাবান গুলে তাতে ভালো করে ডুবিয়ে ও ধুয়ে শোধন করতে হবে। এতে কুঁড়ি বা চোখে কোনো রোগজীবাণু থাকলে সেগুলো নিষ্ক্রিয় হবে বা মরে যাবে।

চারা তৈরির জন্য মিডিয়া বা মাধ্যম লাগবে। তাই ৭০% ধানের পোড়া তুষ ও ৩০% ভার্মিকম্পোস্ট বা দো-আঁশ মাটি একসাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেই চারা জন্মানোর মাধ্যম বা মিডিয়া তৈরি করতে হবে। একটি চৌকা ট্রেতে এই মাধ্যম বা তুষ-মাটি ভরতে হবে। পানির ছিটা দিয়ে তা ভিজাতে হবে। এরপর চোখগুলো সারি করে ৮-১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রেখে বসাতে হবে। চোখের পিঠ থাকবে উপরে। শুকনো পোড়া তুষ বা মাধ্যম ছিটিয়ে চোখগুলো ঢেকে দিতে হবে। পানির ছিটা দিয়ে তা ভিজাতে হবে। রোজই অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ট্রের মাধ্যম ও চোখ ভিজাতে হবে। এভাবে রেখে দিলে চোখগুলো থেকে চারা বের হবে। মাসখানেক বয়স হলে চারাগুলো রোপণের উপযুক্ত হবে।

টিসু কালচার চারার কলা চাষে সুবিধা

টিসু কালচার পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে একসাথে প্রচুর চারা তৈরি করা যায়। সম্পূর্ণ রোগমুক্ত চারা পাওয়া যায়। এমনকি চারা লাগানোর পরও শুধু সিগাটোকা রোগ ছাড়া আর তেমন কোনো রোগ হয় না। মাত্র ৮-৯ মাসের মধ্যে কলা পাওয়া যায়, যেখানে অন্য জাতের কলা পেতে ১১-১৫ মাস অপেক্ষা করতে হয়। অন্য জাতের চেয়ে ফলন দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি। একটি কাঁদির ওজন ৩০ কেজি পর্যন্ত হয়। একসাথে ফল আসে ও একসাথে সব কাঁদি কাটা যায়।

ঘেরের পাড়ে ও মাঠে কলা চাষ প্রযুক্তি

গর্ত তৈরি : ঘেরের পাড় ৩ মিটারের বেশি চওড়া হলে ২ সারি আর এর কম চওড়া হলে এক সারিতে এ জাতের কলার চারা রোপণ করা যায়। শতকে ১০০টি গাছ রোপণ করা যায়। চারা থেকে চারার রোপণ দূরত্ব দিতে হয় ৬ ফুট বা ২ মিটার। মাঠে বাগান আকারে জি-৯ কলা চাষ করতে চাইলে লাগবে উঁচু বন্যামুক্ত জমি যেখানে নিকাশ ব্যবস্থা ভালো আছে। জমি পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত করার পর সেখানে ৬ ফুট পর পর সারি করে প্রতি সারিতে ৫ ফুট পর পর চারা লাগানোর জন্য গর্তের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। ৬x৬ ফুট দূরত্ব দিলে এক একরে ১২০০টি চারা রোপণ করা যায়। চারা রোপণের আগে সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে সব দিকে ৪০-৪৫ সেন্টিমিটার মাপে গর্ত তৈরি করতে হয়। গর্তের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ১০ কেজি গোবর বা খামারজাত সার, ১০০-১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০-১৫০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম জিপসাম ও ১০ গ্রাম জিংক সালফেট সার মিশিয়ে গর্ত ভরে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। গর্তের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ২৫০ গ্রাম নিম খইল ও ২০ গ্রাম দানাদার কীটনাশক (কার্বোফুরান জাতীয়) দিতে পারলে উপকার হয়, এতে মাটিতে কৃমি থাকলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গর্তের মাটি হালকা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণের সময় : বছরের যে কোনো সময় এ কলার চারা রোপণ করা যায়। তবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চারা রোপণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়।

চারার হার : এক একর ঘেরের চারদিকের পাড়ে রোপণের জন্য প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি চারা লাগবে। একক বাগান আকারে মাঠে এ কলার চাষ করলে ১ একর জমিতে ১৪০০ থেকে ১৫০০টি চারা রোপণ করা যায়।

চারা রোপণ : পলিব্যাগে জন্মানো টিসু কালচারের চারা রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগ কেটে ফেলে দিয়ে চারা গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে। রোপণের পর গর্তে সেচ দিতে হবে। চারার ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি হলেই তা রোপণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পলিব্যাগ বা ট্রেতে উৎপাদিত চারার বয়স ১ মাস হলে তা রোপণ করা যায়।

সার ও সেচ প্রয়োগ : সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার গর্ত তৈরির সময় মাটির সাথে প্রয়োগ করতে হবে। গাছপ্রতি ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চারপাশে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। গর্তের মাটি শুকিয়ে এলেই সেচ দিতে হবে।

ঠেকনা দেওয়া : স্বাভাবিকভাবে গাছ কাঁদির ভার সইতে পারে, তবে কাঁদি খুব বড় হয়ে গেলে বাঁশ দিয়ে ঠেকনা দেওয়া ভালো।

লেখক : কৃষিবিদ ও লেখক, অতিরিক্ত পরিচালক (অবঃ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ১২১৫, মোবাইল : ০১৭১৮২০৯১০৭, ইমেইল : kbdmrityun@yahoo.com

মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিল : উপকূলের কৃষকদের জন্য একটি আশীর্বাদ

ড. এম জি নিয়োগী

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মুগডালের তিন ভাগের দুই ভাগই দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা বৃহত্তর বরিশাল থেকে আসে। বিশেষ করে পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলেই প্রতি বছর ১ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে প্রায় ২ লক্ষ টন মুগডাল উৎপাদন হয়, যা বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মুগডালের অর্ধেকেরও বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এখানকার কৃষকরা মুগডাল চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছেন; কারণ উপকূল অঞ্চলে ৪ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি জমি শুষ্ক মৌসুমে পতিত থাকছে। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ কৃষকরা বছরে একটি মাত্র ফসল আমন ধান আবাদ করতে পারেন, যা ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কৃষকরা সাধারনত: কেটে থাকেন। ধান কাটার পরে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া বেশকিছু জায়গায় জলাবদ্ধতা এবং এই এলাকার সেচযোগ্য পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কৃষক বছরের বাকি সময় আর তেমন কোন ফসল আবাদ করতে পারেন না। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ধান কাটার সময় জমিতে সাধারণত লবণাক্ততা কম থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসেও লবণাক্ততা সহনীয় পর্যায়ে থাকে। মার্চ মাসে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে এবং এপ্রিল-মে মাসে খুবই বেড়ে যায়। মুগডাল অত্যন্ত কম সময়ের ফসল, মাত্র ৭০-৭৫ দিনে এই ফসল ঘরে তোলা যায়, অর্থাৎ এরচেয়ে কম সময়ে আর কোন ফসল ঘরে তোলা যায় না। মূলত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আমন ধান কাটার পর যখন কোন প্রকার শীতকালীন বা দানাজাতীয় কোন ফসল চাষাবাদের সময় থাকে না, তখন একমাত্র মুগডাল ফসল জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে জমিতে বপন করা যায়।

সেই জন্য ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ধান কাটার ঠিক পরেই পতিত জমিতে চাষ দিয়ে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে জমিতে জোঁ অবস্থায় যদি মুগডালের বীজ বোনা যায়, তাহলে বীজ বোনার ৭০-৭৫ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ মার্চের শেষে বা এপ্রিল মাসের প্রথমেই অর্থাৎ জমিতে লবণাক্ততা বাড়ার আগেই প্রথমবারের ফসল ঘরে তোলা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এখন আগাম বৃষ্টি হচ্ছে। এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টি হলে লবণাক্ততার তীব্রতা হ্রাস পায়। তখন দ্বিতীয়বার এমনকি তৃতীয়বারও মুগ ফসল ঘরে তোলা সম্ভব। হালকা বৃষ্টি হলে মুগ ফসলের জন্য ভাল। তবে বেশি বৃষ্টি হলে অথবা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে জমিতে মুগ ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও মুগ গাছের শিকড়ে নডিউল তৈরি হয়, যা মাটিকে উর্বর করে। মুগ ফসল তোলার পর পুরো গাছ জমিতে মিশিয়ে দিলে জমির উর্বরতাও বাড়ে। এতে জমির লবণাক্ততাও কিছুটা কমে যায়।

> মিনি-মিল একটি ছোট আকারের ডাল ভাঙানোর মেশিন, যা স্থানীয় কারিগর দ্বারা তৈরি। এর খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য

বরিশাল অঞ্চলের কৃষকরা প্রচুর মুগডাল চাষাবাদ করছেন। কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত বাজারমূল্য পাচ্ছেন না। বাজারে এক কেজি মুগডালের মূল্য ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা, কিন্তু কৃষক তাদের উৎপাদিত মুগ কালাই (খোসাসহ) মাত্র ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। মূল সমস্যা হচ্ছে, মুগডাল উৎপাদিত এলাকায় মুগকালাই ভাঙানো মেশিন না থাকার কারণে কৃষক তার উৎপাদিত মুগকালাই অর্ধেকেরও কম মূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

যেহেতু কৃষকরা ১৪০-১৬০ টাকার মুগডাল মাত্র ৫০-৬০ টাকায়

বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, সেজন্য তারা মুগ কালাইয়ের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারনতঃ প্রতিটি গ্রামেই ধান, গম, মরিচ, হলুদ, সরিষা ইত্যাদি ভাঙানোর মেশিন আছে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য খুব সহজেই গ্রামের এই সমস্ত মেশিন থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে খেতে পারেন এবং বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু গ্রামের এই সমস্ত মিলে মুগকালাই ভাঙানোর কোন মেশিন না থাকার কারনে কৃষক বাধ্য হয়েই অত্যন্ত কম মূল্যে ফড়িয়াদের কাছে বা স্থানীয় বাজারে তাদের উৎপাদিত মুগ কালাই বিক্রি করে দেন। এমনকি অত্যন্ত সুস্বাদু পুষ্টি সমৃদ্ধ এই মুগডাল কৃষক পরিবারের সদস্যরা খেতেও পারেন না। মুগ ডাল খেতে হলে বাড়িতে যাঁতা বা শিল-পাটায় মুগকালাই ভাঙিয়ে নিয়ে তা কুলাতে পরিষ্কার করে তারপরে রান্না করতে হয়– যা অত্যন্ত কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ। সেজন্য কৃষকদের ঘরে মুগকালাই থাকলেও এমনকি মুগডাল তাদের পছন্দনীয় খাবার হওয়া সত্ত্বেও তারা সপ্তাহে এক দিন বা মাসে মাত্র ২-৩ দিন মুগডাল খেয়ে থাকেন।

এছাড়া বাজারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রং এবং কেমিক্যালযুক্ত গাঢ় হলুদ রংয়ের মুগডাল বিক্রি হচ্ছে, যা মানব শরিরের জন্য ক্ষতিকর। পরিষ্কার পানিতে রং এবং কেমিক্যালযুক্ত গাঢ় হলুদ রংয়ের এই মুগডাল ভিজিয়ে রাখলে সমস্ত পানি কিছুক্ষণের মধ্যেই হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। সাধারণ মানুষ বাজারের এই সমস্ত মুগডাল কিনে প্রতারিত হচ্ছেন।

সে সাথে মুগডাল চাষাবাদকে কৃষকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয় করার জন্য অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের এই যৌথ প্রকল্প (CIM-২০১৪-০৭৬) বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যাতে করে কৃষকরা মুগডাল উৎপাদন করে কাঙ্ক্ষিত বাজারমূল্যে পায় এবং পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিসমৃদ্ধ এই মুগডাল যেন নিয়মিত খেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের এই যৌথ প্রকল্প দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ড. এম জি নিয়োগীর তত্ত্বাবধানে মুগকালাই ভাঙানোর জন্য মিনি-মিল নিয়ে গবেষণা করেছেন। মিনি-মিল একটি ছোট আকারের ডাল ভাঙানোর মেশিন, যা স্থানীয় কারিগর দ্বারা তৈরি। এর খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য। গ্রামে গ্রামে ধান ভাঙানো, গম ভাঙানো, হলুদ-মরিচ ভাঙানো মেশিন আছে। এ সমস্ত মেশিন স্থানীয় মিস্ত্রিরাই তৈরি করে থাকেন। কিছু কিছু এলাকায় ছোট ছোট ডাল ভাঙানো মেশিনও আছে।

ইতোপূর্বে ACIAR-Murdoch University ডাল ভাঙানোর মেশিন নিয়ে কাজ করেছিল। মূলত এখান থেকেই ডাল ভাঙানোর মেশিনের বিষয়ে আমাদের ধারণা হয় এবং CIM-২০১৪-০৭৬ প্রকল্পের তথ্য উপাত্তেও প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামে গ্রামে মুগডাল ভাঙানো মেশিন থাকলে, কৃষক তাদের উৎপাদিত মুগডাল সহজেই ভাঙাতে পারবে– ভালো মূল্যে বাজারে বিক্রি করতে পারবে এবং প্রতিদিন তারা মুগডাল খেতে পারবে, যা পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা মিটাবে।

এই মিনি-মিল দিয়ে এখন অনায়াসে মুগকালাই ভাঙানো যাচ্ছে। বিশেষ ধরনের রোলার এই মিনি-মিলে বসানো হয়েছে। এতে মুগকালাইয়ের খোসা ছাড়ানো ত্বরান্বিত হয়। মুগকালাইয়ের খোসা সহজে ছাড়ানোর জন্য মুগকালাইকে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। দেখা গেছে, ৫ কেজি মুগকালাইয়ে ৩০ গ্রাম পরিমাণ সয়াবিন বা সরিষার তেল মাখিয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিলে এই মেশিনে খুব সহজেই মুগকালাই ভাঙানো যায়। এই মিনি-মিলে শুধু মুগকালাই নয় - মসুর, খেসারিসহ অন্যান্য ডালও ভালভাবে ভাঙানো যায়।

মিনি-মিল ১৫ হর্স পাওয়ারের ডিজেল ইঞ্জিন বা ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা চালিত। এটি কাঠের তৈরি প্লাটফর্ম, রোলার, পাওয়ার ট্রান্সমিশন পুলি, স্টার্টার, কাটআউট, ফিডিং চেম্বার, সিভ, ট্রে, সেফটি কভার, কেসিট, বেল্ট, তার, লোহার রড এবং বল বিয়ারিং দ্বারা সংযুক্ত। এ পর্যন্ত বরিশাল, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার মুগডাল উৎপাদিত এলাকায় গ্রামে গ্রামে চলমান ধান ভাঙানো মিলে পরীক্ষামূলকভাবে ১০টি মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিল বসানো হয়েছে। অভাবনীয় ফলাফলের প্রেক্ষিতে, ২০২২ এর জুন-জুলাই মাসে আরো ২০টি মিনি-মিল বসানোর কাজ হচ্ছে, যার খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য এবং স্থানীয় কারিগররাই প্রয়োজনে এই মিনি-মিলগুলো মেরামত করতে পারবে।

যে ১০টি গ্রামে এ সমস্ত মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিল বসানো হয়েছে, সেখানকার মুগডাল কৃষকরা আজ ব্যাপকভাবে মুগডাল চাষাবাদে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত। তারা তাদের উৎপাদিত মুগডাল এই মিনি-মিলে মানসম্মতভাবে ভাঙাতে পারছে। বাজারে তা দ্বিগুণের বেশি মূল্যে বিক্রি করে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে। এখন তাদের পরিবার প্রায় প্রতিদিনই এই পুষ্টি সমৃদ্ধ মুগডাল খেতে পারছে। আমাদের বিশ্বাস, শুধুমাত্র মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিলের কারণেই এই অঞ্চলের কৃষকরা মুগডাল চাষাবাদে যত্নবান হচ্ছেন। এতে প্রায় দ্বিগুন ফলন নিশ্চিত হচ্ছে। এই মিনি-মিল উপকূল অঞ্চলে মুগডাল সম্প্রসারণে ব্যাপক অবদান রাখছে।

এ ধরণের মিনি-মিল প্রতিদিন এক থেকে দুই হাজার কেজি পর্যন্ত ডাল ভাঙাতে পারে। ডাল ভাঙানোর পাশাপাশি গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য কৃষক ভূষি পাচ্ছে

আমরা আশা করি সরকার মিনি-মিল প্রযুক্তির উপযোগিতা অনুধাবন করে উপকূলের গ্রামে গ্রামে মুগডাল ভাঙানো মিনি-মিল বসানোর উদ্যোগ নিবে এবং উপকূলের পতিত জমিতে মুগডাল উৎপাদন ও বিস্তারে ভূমিকা রাখবে। অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের ৫০ বছরের বন্ধুত্বের এটিই হোক উপকূলের কৃষকদের জন্য সবচেয়ে বড় টেকসই উপহার।

লেখক : ডেপুটি প্রজেক্ট লিডার, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। মোবাইল: ০১৭১২-০৪৯৭৪২, ইমেইল : mgneogi@gmail.com,

বাউ-মানকচু ১ উৎপাদন প্রযুক্তি ও পুষ্টিগুণ

ড. এম এ রহিম[১] ড. সুফিয়া বেগম[২] মো. আবু জাফর আল মুনছুর[৩]

বাউ-মানকচু ১ (*Alocasia indica*) একটি জনপ্রিয় অপ্রচলিত কন্দজাতীয় ফসল যা বাণিজ্যিকভাবে বৃষ্টি বহুল অঞ্চলে, বসতবাড়ির বাগানে, পতিত জমি, ফল বাগান, ধানক্ষেতের বা ফসলি জমির আইল এবং আন্তঃফসল (যেমন-কলা, নারিকেল বাগান, পেঁপের বাগান বা অন্যান্য দীর্ঘতম ফসল এবং পার্বত্য অঞ্চলে আনারস) হিসেবে চাষ করা যায়। মানকচু ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশে অপ্রচলিত কন্দ ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কচিপাতা, পাতার ডাটা এবং করম বা কন্দ সবজি হিসেবে এবং ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে যা বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যেমন- দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্ভিক্ষ, খরা, লবনাক্ততা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

বাউ-মানকচু ১, স্থানীয়ভাবে মানকচু এবং মগুরকচু নামে পরিচিত। এই প্রজাতিটি (Araceae) পরিবারের একবীজ পত্রি হার্বস জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশে মূলত দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে যেমন- যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল এবং পটুয়াখালীতে চাষাবাদ হলেও বাংলাদেশে সকল অঞ্চলে চাষ করা যেতে পারে। বাড়ির আশপাশে পতিত জমি ইত্যাদিতে চাষ করা যায় ফলে অন্যান্য ফসলের সাথে প্রতিযোগী নয়। আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায় এবং তেমন যত্ন নিতে হয় না বিধায় এর উৎপাদন খরচ খুবই কম এবং সারা বছরই কচি পাতা, ডাটা সবজি হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ২৫-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় আবাদ করা যায়। পাতা হলুদাভ সবুজ বর্ণের এবং হলুদাভ কমলা রঙের ফুল হয়। গুড়ীকন্দ বেলুন আকৃতির এবং লম্বা হয়।

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে সর্বত্র চাষযোগ্য। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। খড়া হলে সেচ দেওয়া যেতে পারে। ইহা জলবদ্ধতা ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। বেলে দোঁ-আশ, দোঁ-আশ, সামান্য লবণাক্ত মাটিতে ভালো জন্মে। উঁচু, মাঝারি উঁচু এবং সমতল ভূমিতে চাষ করা যায়।

জাত : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জার্মপ্লাজম সেন্টার কর্তৃক বাউ-মান কচু ১ জাতটি ২০২১ সালে জানুয়ারি মাসে নিবন্ধিত হয়েছে। জাতটি উচ্চফলনশীল, পুষ্টি ও ঔষুধি গুণ সম্পন্ন।

চাষাবাদ পদ্ধতি : ৪-৫ টা চাষ দিয়ে এবং মই দিয়ে মাটি আগলা ও ঝুর ঝুর করতে হবে। মাটির গভীরতা (১৫-২০ সেমি.), pH ৫.৫-৬.৫ উত্তম। উদ্ভিদ লম্বা/বেলুন আকৃতির করম ও প্রচুর চারা উৎপন্ন করে। করম কাটিং, ছোট চারা এবং উদ্ভিদের কাণ্ডের উপরের অংশ বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বছরব্যাপী চাষাবাদ করা যায়। রোপণ দূরত্ব : ৭৫×৬০ সেমি. ঠাণ্ডা অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে রোপণ না করলেও চলে।

সার প্রয়োগ : গোবর ১৫ টন/হেক্টর, ইউরিয়া ২০০ কেজি/হেক্টর, ট্রিপল সুপার ফসফেট ১২৫ কেজি/হেক্টর এবং মিউরেট অব পটাশ ১৮৫ কেজি/হেক্টর ব্যবহার করা যায়। জমি তৈরির সময় শেষ চাষের পর গোবর সারসহ মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : ১ সপ্তাহ পর পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। দেড় থেকে দুই মাস পর চারা পাতলাকরণ করতে হবে। প্রয়োজনে পানি সেচ ও নিষ্কাশন করা যেতে পারে। খড়া মৌসুমে চারা লাগালে প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে পানি সেচ প্রয়োজন।

রোগবালাই : বাউ-মানকচু ১ এর তেমন কোন রোগবালাই হয় না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় চারা অবস্থায় উদ্ভিদটির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গাছ মারাও যায়।

ফসল সংগ্রহ : সারা বছরই কচিপাতা, ডাটা সবজি হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। করম বা গুড়ি কন্দ জুলাই-আগস্ট মাসে সংগ্রহ করা যায়। ৪-৫ মাসের মধ্যেই গুড়ি কন্দ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। উদ্ভিদের কাণ্ডের অংশ (কন্দের উপরের অংশ) কেটে বীজ হিসেবে অন্য জায়গায় লাগানো যায়। গুড়ি কন্দ বাজার জাত করা যায়। এভাবেই সারা বছরই পাতা, ডাটা, কন্দ পাওয়া যেতে পারে। বাউ-মানকচু ১ এর মাংসল সাদা অংশ সু-স্বাদু তবে কাঁচা খাওয়া যায় না। সামন্য গলা চুলকায়। রান্না বা খাওয়ার জন্য গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হয়। হেক্টরে ২৫-৩৫ টন ফলন হয়ে থাকে।

ফসল সংরক্ষণ : কন্দ কাটিং ও ছোট চারা বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দ ভেজা থাকলে হালকা রৌদ্রে শুকিয়ে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থান এবং উঁচু মাচায় সংরক্ষণ করা ভালো।

ফসলের প্রয়োজনীয়তা : বাউ-মানকচু ১ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে এবং গ্রামীণ জনগণের কাছে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানকচু ১ বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়ান অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত ফসল এবং পুষ্টি ও ঔষধি গুণ বিশিষ্ট ফসল। এটি এন্টি-ফাঙ্গাল, এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল, এন্টি-রিওমাটিজম, ক্যান্সার প্রতিরোধী, এন্টি-ইনফ্লামেটরি ইত্যাদি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিগুণ: ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং এন্টি অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারিসহ যেকোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় খাদ্য সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ রক্ষা ও জনগণকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাউ-মানকচু ১ এর মতো অপ্রচলিত ফসল আবাদ করে আমাদের খাদ্য পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

লেখক : [১]প্রফেসর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, মোবাইল : ০১৭৭২১৮৮৮৩০, ই-মেইল : marahim1956@bau.edu.bd; [২]সহকারী অধ্যাপক (অব.) একেইউ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজ। মোবাইল : ০১৭১৬৬০৭৫৫৬, ই-মেইল: sufia beg@yahoo.com; [৩]তথ্য অফিসার (পিপি), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৪১০৪৮৫৩, ই-মেইল : almunsurdae@gmail.com

বিপন্ন প্রজাতির মহাশোল মাছ : প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

আবহমান কাল থেকে মাছ বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মিঠাপানির মাছের মধ্যে সুস্বাদু মহাশোল মাছ 'স্পোর্ট ফিশ' হিসেবে খ্যাত যা আজ বিলুপ্ত প্রায়। মহাশোল মাছটি অঞ্চলভেদে মহাশের, মাশোল, টর, চন্দনা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে পাওয়া যায় মহাশোলের দুইটি প্রজাতি, একটি লাল পাখনার হিমালয়ের মহাশোল (*Tor tor*), অন্যটি সোনালী মহাশোল (*Tor putitora*)। এক সময় বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিমালয়ের নদীগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মাছটি দেখা যেত। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মিঠাপানির জলাশয়ের খাল, বিল, লেকে একসময় পাওয়া গেলেও নেত্রকোনার পাহাড়ি ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি আর সোমেশ্বরী ও কংস নদী মহাশোল মাছের প্রধান আবাসস্থল। দ্রুত

চাষের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মহাশোল মাছের (*Tor putitora*) কৃত্রিম প্রজনন, নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে

আবহাওয়া পরিবর্তন, নদীগুলোর স্বাভাবিক অবস্থা ধ্বংস, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, শুকনো মৌসুমে নদী শুকিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। মাছটির ডিম ধারণক্ষমতা (৬০০০-১১০০০/কেজি) অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের তুলনায় কম যা মাছটির বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং চাষের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মহাশোল মাছের (*Tor putitora*) কৃত্রিম প্রজনন, নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে।

মহাশোল মাছের বৈশিষ্ট্য : স্বাদ, পুষ্টিমান এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় মহাশোল মাছের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মহাশোল সাধারণত ৫২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ওজন ৯ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর দেহ লম্বা, মুখ অধোমুখী অপেক্ষাকৃত ছোট। দেহের বর্ণ উপরের দিকটা বাদামি সবুজ, পেটের দিকটা রূপালী এবং পিঠের পাখনা লালচে বর্ণের হয়ে থাকে। মহাশোল দেখতে খুব সুন্দর, অনেকটা মৃগেল মাছের মতো। মহাশোলে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ ও অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। পাহাড়ি খরস্রোতা নদী, ঝর্ণা, লেক এদের মূল আবাসস্থল। শীতকালে এ মাছটি প্রজনন করে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য মাছের তুলনায় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এ মাছটি সহজে রোগাক্রান্ত হয় না।

মহাশোল মাছের প্রজনন : পাথরসমৃদ্ধ খরস্রোতা নদীর তলদেশ এদের প্রধান প্রজনন স্থান। জলের তাপমাত্রা, যেমন- হিমালয় থেকে প্রবাহিত বরফ গলা ঠাণ্ডা পাহাড়ি নদী, পরিষ্কার অগভীর পানি এবং মৌসুমি বৃষ্টিপাত এদের প্রজননকে উদ্দীপিত করে। উজান স্রোতে এরা যুগলবন্দী হয়ে প্রজননে অংশ নেয়। প্রজননকালে স্ত্রী মাছ প্রথমে ডিম ছাড়ে, পরে পুরুষ মাছ তার উপর বীর্যপাত ঘটিয়ে ডিম নিষিক্ত করে। এরা লিঙ্গভেদী। মুখে শক্ত ও প্রলম্বিত গোফ, বিস্তৃত-লম্বা-খসখসে বক্ষ পাখনা আইস পর্যন্ত বিস্তৃত। বক্ষ পাখনাই পুরুষদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করার প্রধান হাতিয়ার। পুরুষ মাছ জন্মের ২য় বছর এবং স্ত্রী মাছ ৩য় বছরে যৌন পরিপক্বতা অর্জন করে। প্রজননকালে অন্যান্য মাছের মতো এরা রঙ বদলায় না, তবে স্ত্রী মাছের পায়ু অঞ্চলটি বেশ নরম এবং হালকা গোলাপি হয়। পুরুষ মাছের আকার স্ত্রী মাছের তুলনায় ছোট হয়। বিপন্ন প্রজাতির সোনালি মহাশোলের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ কৌশল বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ গবেষণায় সফল হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে এর চাষাবাদ করা হচ্ছে। নিম্নে মহাশোল মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন এবং চাষ কৌশল বর্ণনা করা হলো।

কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

ব্রুড মাছ প্রতিপালন : সাধারণত নভেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত এই তিন মাস মহাশোল মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। প্রজনন মৌসুমের ১-২ মাস পূর্বে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত ব্রুড মহাশোল মাছ সংরক্ষণ করতে হবে। সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর (৪-৫ ফুট) প্রজননক্ষম মাছের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ব্রুড মাছ হেক্টর প্রতি ১,০০০-১,৫০০টি মজুদ করলে এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা ১৭-২২ ডিগ্রি সে. বজায় রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়।

খাদ্য প্রয়োগ ও পরিচর্যা : মাছের পরিপক্বতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিদিন পুকুরে ২-৩ ঘণ্টা পরিষ্কার পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়মিত পানির তাপমাত্রা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, ক্ষারত্বের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মজুদকৃত ব্রুড মাছকে ২৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য দৈহিক ওজনের ৪-৫% হারে প্রতিদিন সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া ভাসমান পিলেট খাবার সম্পূরক খাবার হিসেবে দেয়া যেতে পারে। পুকুরের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য হেক্টরপ্রতি ২৫ কেজি ইউরিয়া ও ৪০ কেজি টিএসপি ১৫ দিন পর পর পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রজনন ও পোনা প্রতিপালন কৌশল : প্রজনন মৌসুমে পরিপক্ব

স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয় ডিমে ভর্তি থাকে বলে পেট ফোলা ও স্ফীত হয় এবং বক্ষ পাখনা মসৃণ থাকে। পুরুষ মাছের বক্ষ পাখনা খসখসে এবং জননাঙ্গের সামান্য উপরে চাপ দিলে সাদা মিল্ট বের হয়ে আসে। এ মাছের প্রজননের জন্য কোন প্রকার হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না। শুধুমাত্র চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ মাছ থেকে ডিম ও মিল্ট সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত ডিমের সাথে ১-২ ফোটা মিল্ট মিশিয়ে ০.৮% সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফিজিওলজিক্যাল দ্রবণ দিয়ে ডিম নিষিক্ত করা হয়। নিষিক্ত ডিমগুলোকে কয়েকবার ডিপ-টিউবওয়েলের পানি দিয়ে ধুয়ে ডিমের আঠালোভাব দূর করে হ্যাচিং জারে স্থাপন করতে হবে। সাধারণত ২১-২৩ ডিগ্রি সে. পানির তাপমাত্রায় ৮০-৮৫ ঘণ্টা পর ডিম ফুটে লার্ভি বের হয়ে আসে। মহাশোল মাছের ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৭০-৭৫% হয়ে থাকে। লার্ভির বয়স পাঁচ দিন হলে এদের খাবার হিসেবে হাঁস-মুরগীর ডিমের সিদ্ধ কুসুম সরবরাহ করা হয় এবং এ সময়ই রেণুপোনা আঁতুড় পুকুরে ছাড়ার উপযোগী হয়। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত রেণুপোনার বাঁচার হার ৮০-৯০% হয়ে থাকে।

মহাশোল মাছের নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : নার্সারি পুকুরের আয়তন ১০-২০ শতাংশ এবং গভীরতা ০.৮০-১.০ মিটার হতে হবে। পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনায় ইনলেট ও আউটলেট থাকা নার্সারি পুকুর অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সাধারণত কার্পজাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনার মতো মহাশোলের নার্সারি পুকুর থেকে বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা যেমন-কচুরিপানা, টোপা পানা এবং তল্ল জাতীয় বিভিন্ন শেওলা দমন করতে হবে। অতঃপর পুকুর শুকিয়ে বা রোটেনন (১ পিপিএম) প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত মাছ দমন করতে হবে। শুষ্ক পুকুরের তলদেশে বা নির্ধারিত গভীরতায় পানিতে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য চুন প্রয়োগের ১-২ দিন পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে জৈবসার (গোবর) প্রয়োগ করতে হবে। জৈবসার (গোবর) প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পুকুরের পানি হালকা বাদামি রঙ ধারণ করলে পুকুর পোনা মজুদের উপযোগী হয়।

রেণুপোনা সংগ্রহ ও নার্সারিতে মজুদ : হাঁস পোকাসহ অন্যান্য অনিষ্টকারী পোকা বা বড় আকারের জুপ্লাংক্টন দমন করার জন্য পোনা মজুদের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে প্রতি শতাংশে সুমিথিয়ন ১০ মিলি হারে প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারি পুকুরে ৫ দিন বয়সে রেণুপোনা (১.১২-১.২৫ সেমি.) প্রতি শতাংশে ৩,০০০টি (৭৫০,০০০ টি/হেক্টর) ছাড়তে হবে। নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদের পর সম্পূরক খাবার হিসেবে ১ম সপ্তাহে নার্সারি ফিড এবং পরবর্তী ৬ সপ্তাহ স্টার্টার-১ ফিড পোনার দৈহিক ওজনের ৭-১০ ভাগ হারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার নমুনায়ন করে পোনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাবারের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে। এভাবে ২ মাস পোনা লালন পালনের পর পোনার আকার ৬.০-৭.০ সেমি. হলে চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযোগী হয়।

পোনা উৎপাদন ও আহরণ : নার্সারি পুকুরে ২ মাস লালনের পর পর্যায়ক্রমে জাল টেনে এবং পুকুর শুকিয়ে চারা পোনা আহরণ করা হয়। এ ধরনের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় হেক্টরপ্রতি গড়ে ৫.০-৫.৫ লক্ষ অঙ্গুলী পোনা উৎপাদন করা যায়।

মহাশোল মাছের মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা : আধুনিক মৎস্য চাষে রুই জাতীয় মাছের সাথে মহাশোল মাছের মিশ্রচাষ করা যায়। ফলে পুকুরের সকল স্তরের পানির উৎপাদনশীলতাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিমানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। পুকুরের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান সব ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হলো মিশ্রচাষের প্রধান উদ্দেশ্য।

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : মিশ্রচাষের জন্য পুকুরের আয়তন ৪০-১০০ শতাংশ এবং বছরে ৮-১২ মাস ১.০-১.৫ মিটার পানি থাকে এরকম পুকুর নির্বাচন করতে হবে। মহাশোল মাছের চাষ পদ্ধতি অনেকটা অন্যান্য কার্পজাতীয় মাছের চাষ পদ্ধতির মতই। জলজ আগাছা যেমন- কচুরিপানা, কলমীলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি শেকড়সহ দমন করা প্রয়োজন। পুকুর শুকিয়ে অথবা রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করতে হবে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি হেক্টরে ২৫০ কেজি হারে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর প্রতি হেক্টরে ১২.৫ কেজি ইউরিয়া এবং ২৫ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর পুকুরের পানি সবুজাভ হলে মাছের পোনা মজুদের উপযোগী।

সম্পূরক খাদ্য ও সার প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা কৌশল : মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পুকুরে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে। মাছ ছাড়ার পরের দিন থেকে মজুদকৃত পোনার দৈহিক ওজনের শতকরা ২-৬ ভাগ হারে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে নমুনায়ন করে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ মাছের দৈহিক ওজনের সহিত সঙ্গতি রেখে সম্পূরক খাদ্যের সমন্বয় করতে হবে। পোনা ছাড়ার ১৫ দিন অন্তর প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রতি হেক্টরে ১২.৫ কেজি ইউরিয়া ও ২৫ কেজি টিএসপি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে পানির গুণাগুণ যেমন-তাপমাত্রা, অক্সিজেন, পিএইচ, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

মাছের উৎপাদন ও আহরণ : পোনা মজুদের ৮-১০ মাস পর জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে মাছ আহরণ করতে হবে। জীবিত বা তাজা মাছ বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা পাওয়ার লক্ষ্যে সময়মতো মাছ আহরণ নিশ্চিত করতে হবে। বাৎসরিক পুকুরে ৮-১০ মাস মিশ্রচাষে মহাশোল মাছ ৬০০-৮০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। মিশ্রচাষে হেক্টর প্রতি কাতলা ২২০০-২৪০০ কেজি, রুই ১৫০০-১৭০০ কেজি, মৃগেল ৭০০-৭৫০ কেজি এবং মহাশোল ৬৫০-৭০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌশল অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি মৎস্য হ্যাচারিসমূহে মহাশোল মাছের পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। মহাশোল মাছের চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে এতদাঞ্চল তথা দেশে এই প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে সুরক্ষা করা যাবে। সে সাথে অনেক দামে বাজারে বিক্রি হওয়া মহাশোলের মূল্য হ্রাস পাবে এবং হারিয়ে যাওয়া সোনালি মহাশোল সুলভ মূল্যে ভোক্তাদের খাবার টেবিলে ফিরে আসবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অপর প্রজাতির মহাশোল (*Tor tor*) নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলমান রয়েছে।

লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ। ফোন : ০৯১৬৫৮৭৪, ই-মেইল : dgbfri@gmail.com

আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা

কৃষিবিদ ডক্টর এস এম রাজিউর রহমান

আমাদের অনেকের ধারণা মহিষ পালনে নদী-নালা, পুকুর-জলাশয় এবং বিস্তীর্ণ চারণ ভূমি প্রয়োজন। কিন্তু এ ধারণার বাইরেও, আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালন করা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন পালন ব্যবস্থাপনা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞান। দেশে দুধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য দুধালো গাভীর পাশাপাশি দুধালো মহিষ পালনের গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে পারিবারিকভাবে অথবা আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো জাতের মহিষের খামার গড়ে উঠেছে। ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ যারা মহিষের দুধ উৎপাদনে শীর্ষে রয়েছে; সেসব দেশে মহিষ আবদ্ধ অবস্থায় পালন হচ্ছে। মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ (৫.৫-৭.৫%) গাভীর দুধের চর্বির (৩.৫-৪.৫%) চেয়ে বেশি। এজন্য দুগ্ধজাত তৈরি শিল্পে মহিষের দুধের বিশেষ কদর রয়েছে। এ ছাড়াও মহিষের দুধে কোলেস্টেরলের পরিমাণ (০.৬৫ মিলিগ্রাম/গ্রাম) গাভীর দুধের (৩.১৪ মিলিগ্রাম/গ্রাম) চেয়ে কম। তাই মহিষের দুধে হৃদরোগের ঝুঁকি কম থাকে। মহিষ কম গুণগতমানের খাদ্যকে পরিপাকের মাধ্যমে উন্নত গুণগতমানের দুধ উৎপাদন করতে সক্ষম। এ ছাড়াও মহিষের বিভিন্ন আবহাওয়ায় খাপখাওয়ানোর সক্ষমতা বেশি।

মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ (৫.৫-৭.৫%) গাভীর দুধের চর্বির (৩.৫-৪.৫%) চেয়ে বেশি। এজন্য দুগ্ধজাত তৈরি শিল্পে মহিষের দুধের বিশেষ কদর রয়েছে। এ ছাড়াও মহিষের দুধে কোলেস্টেরলের পরিমাণ (০.৬৫ মিলিগ্রাম/গ্রাম) গাভীর দুধের (৩.১৪ মিলিগ্রাম/গ্রাম) চেয়ে কম

আবদ্ধ অবস্থায় মহিষ পালনে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে–

জাত (Breed) : বাংলাদেশে আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালনের জন্য মুররাহ সংকর, গুজরাটি সংকর ও দেশি জাতের মহিষ পালন করা হয়। মুররাহ ও গুজরাটি সংকর জাতের মহিষ উত্তরাঞ্চলের গরু/মহিষের হাট থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে (দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর) এ ধরনের মহিষ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এসব জাত প্রতি দুগ্ধ উৎপাদনকালে (২২০-২৫০ দিনে) ১৬০০-১৮০০ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।

বাসস্থান (Housing): ছায়াযুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রেখে প্রতিটি দুধালো মহিষের জন্য ৪-৫ বর্গমিটার জায়গার সংস্থান করে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিষের ঘর মাটি, খড় এবং বাঁশ দিয়ে করা যেতে পারে। তবে সংকর জাতের গাভীর ন্যায় পাকাঘরে, বৈদ্যুতিক পাখা ও পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রেখে দুধালো মহিষ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা যায়। মহিষের শরীরে ঘর্মগ্রন্থি (Sweet gland) কম হওয়ার কারণে অতিরিক্ত তাপমাত্রা নির্গত করতে পারে না। এজন্য মহিষকে পুকুরে বা নদীতে দিনের অনেক সময় ডুবে থাকতে (Wallowing) দেখা যায়। অতিরিক্ত গরমে মহিষের শরীরের তাপমাত্রা, নাড়ীর স্পন্দন এবং রেচনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে গিয়ে উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন দক্ষতা কমে যায়। এজন্য আবদ্ধ অবস্থায় মহিষকে দিনে দুই/তিনবার গোসল করাতে হবে। তবে আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) সময় সপ্তাহে এক/দুইবার এবং গরমের সময় দিনে দুই/তিনবার গোসল করানো হয়। বাণিজ্যিকভাবে আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালনের জন্য ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা ও স্বয়ংক্রিয় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা রাখা ভালো। এক্ষেত্রে দিনে তিন/চারবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটানো বা গোসল করানোর মাধ্যমে দুধালো মহিষের শারীরিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে সঠিক

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Feeding Management) : আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষের পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস/সাইলেজ এবং প্রয়োজনমাফিক দানাদার খাদ্যমিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়াও খাদ্যে লবণ ও খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। মহিষের দুধ উৎপাদন দক্ষতার উপর নির্ভর করে মহিষের রসদে কি পরিমাণ আমিষ এবং শক্তি প্রয়োজন। মহিষের খাদ্যে বা রসদে ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য সহজপাচ্য, সহজলভ্য ও দামে তুলনামূলক সস্তা হতে হবে। এ লক্ষ্যে গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন মিল, খেসারি ভাঙ্গা, চাল ভাঙ্গা, সরিষার খৈল, কাঁচা ঘাস, খড় প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য দুধালো মহিষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিষের দৈহিক ওজনের ২.৫-৩% শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। আঁশজাতীয় (সবুজ ঘাস/সাইলেজ/হে/খড়) এবং দানাদার খাদ্য হতে এই শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। শুষ্ক পদার্থের এক-তৃতীয়াংশ দানাদার এবং দুই-তৃতীয়াংশ আঁশ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি গ্রহণকৃত শুষ্ক খাদ্যদ্রব্যের জন্য দুধালো মহিষকে দিনে ৫-৬ লিটার পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ৫-৬ গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ২-২.৫ গ্রাম ফসফরাস সরবরাহ করতে হবে। ৪.২ মিলিগ্রাম সিলেনিয়াম (Se) এবং ৪২০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই (E) মিশ্রণ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পোস্টপর্টাম হিট (PPH) ও বাচ্চা দেবার বিরতিকাল কমিয়ে দেয় (Ezzo 1995; El-Nenaey *et al.* 1996) । এছাড়াও খাদ্যদ্রব্যের সাথে জিংক প্রদানের মাধ্যমে দুধালো মহিষকে হিট স্ট্রেস (Heat Stress) থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

মহিষকে আঁশজাতীয় খাদ্য ছোট ছোট করে কেটে প্রয়োজনীয় দানাদার মিশিয়ে প্রদান করলে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়। এ খাদ্য দিনে দুই থেকে চারবার প্রদান করলে রুমেনের কার্যকারিতা সঠিক থাকে বিধায় দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য (চর্বি ৭%) ৬৩ গ্রাম পরিপাচ্য আমিষ (DCP), ০.৪৬০ কেজি মোট পরিপাচ্য পুষ্টি (TDN), ৩.৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ২.৬ গ্রাম ফসফরাস সমৃদ্ধ রসদ তৈরি করতে হবে (ICAR, 1998)। মহিষ পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও সি এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কে তৈরি করতে পারে। তাই অন্যান্য ভিটামিন এ, ডি ও ই খাবারের সাথে বা আলাদাভাবে সরবরাহ করতে হবে। শুকনো খড় ও দানাদার মিশ্রিত রসদে প্রয়োজনীয় পরিপাচ্য আমিষ ও শক্তির পরিমাণ সঠিক থাকলেও ভিটামিন এ ও খনিজ পদার্থের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। বিধায় প্রাণীকে ২৫০০০ আইইউ (IU) ভিটামিন এ ও ১০০ গ্রাম ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট (DCP) প্রদান করতে হবে (Nironjan *et. al.* 2010)। নিম্নে প্রস্তাবিত (Ghose and Devid, 2016) দানাদার খাদ্য মিশ্রণ অনুসরণ করা যেতে পারে। ভুট্টা ভাঙা পাউডার ৩০%; খৈল (তিল/সয়াবিন/সরিষা ৩০-৩৫%; গম/ধানের ভূসি ৩৫-৩৭%; খনিজ লবণ ২%, লবণ ১%। দুধের মহিষকে প্রতিদিন একই সময়ের ব্যবধানে খাবার প্রদান করতে হবে। ফলে রুমেনে নিয়মিত গাঁজন প্রক্রিয়া চলমান থাকে। এ লক্ষ্যে প্রাপ্ত রসদকে ৪টি ভাগে ভাগ করে সরবরাহ করা ভালো। দানাদার খাদ্য আঁশজাতীয় খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করে মহিষকে সরবরাহ করলে খাদ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। এজন্য আঁশজাতীয় খাদ্য ছোট ছোট করে দিতে হবে।

প্রজনন ব্যবস্থাপনা (Breeding System): আবদ্ধ অবস্থায় দুধালো মহিষ পালনে প্রতিবছর একটি বাচ্চা পেতে হলে প্রজনন ব্যবস্থাপনার দিকে ভালোভাবে নজর দিতে হবে। আবদ্ধ অবস্থায় বাণিজ্যিক/পারিবারিকভাবে যারা মহিষ পালন করছে তাদের প্রধান সমস্যা হল সঠিক সময়ে গাভী মহিষকে ভালো জাতের ষাঁড় মহিষ দ্বারা পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করানো। এক্ষেত্রে আবদ্ধ পালনকারীরা নিজ খামারে ষাঁড় মহিষ রাখতে পারে অথবা সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে ভালো জাতের সিমেন (বীজ) পাওয়া গেলে কৃত্রিম প্রজনন করা যেতে পারে। তবে খামারিকে মহিষ প্রজনক্ষম (গরম) হবার লক্ষণ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করতে হবে। লক্ষণ প্রকাশ পাবার ৮-১৮ ঘণ্টার মধ্যে মহিষকে পাল দিতে হবে। মহিষ গরম হবার লক্ষণ বোঝা তুলনামূলক কষ্টকর; বেশির ভাগ মহিষ নীরব হিট (Silent Heat) প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে যোনিপথে হালকা পাতলা মিউকাস দেখে বুঝতে হবে মহিষ প্রজনক্ষম/গরম হয়েছে। বেশির ভাগ (৮০-৮৫%) মহিষ সাধারণত দিনের শেষভাগ হতে রাত্রির শেষভাগে গরম হয়ে থাকে। তবে দিনে অল্পকিছু মহিষ (১০-১৫%) গরম হতে দেখা যায়। খামার/বাসা থেকে দূরে গিয়ে গাভী মহিষকে ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করালে উক্ত স্থানে (৩০-৪০ মিনিট) কিছুক্ষণ গাভী মহিষকে অবসরে রাখতে হবে। অতপর খামারে ফেরত আনতে হবে। এক্ষেত্রে গাভী মহিষকে তাড়াহুড়ো করে বা দৌড়ে আনা যাবে না।

দৈনন্দিন পরিচর্যা (Daily routine) : প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুধালো মহিষের ঘর পরিষ্কার করতে হবে ও মহিষকে ২-৩ গোসল করাতে হবে। ঘরের আবর্জনা (মলমূত্র) দূরবর্তী গর্তে ফেলতে হবে। সকালে ঘর পরিষ্কার করার পর মহিষকে গোসল দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনমাফিক দানাজাতীয় খাবার ও পরিষ্কার পানি প্রদান করতে হবে। অতঃপর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহন শেষ হওয়ার পর সবুজ ঘাস/সাইলেজ/হে/শুকনো খড় সরবরাহ করতে হবে। দুপুরেও মহিষের ঘর পরিষ্কার করে মহিষকে গোসল দিতে হবে এবং প্রয়োজনমাফিক আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করতে হবে। পানির পাত্রে সব

সময় পরিষ্কার পানি রাখতে হবে। বিকালে দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে। গরমের দিনে বিকালে পানির ঝাপটা অথবা গোসল করাতে হবে। দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ নির্ভর করে। শীতের সময় শুষ্কখাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দৈহিক ওজনের ১.৪-১.৮% হয়ে থাকে এবং গরমের সময় ২.২-৩.০% হয়ে থাকে (Fiest, 1999)। তাই সন্ধ্যা বেলা ঘরের লাইট জ্বালালে খাদ্য গ্রহণের সময় বৃদ্ধি পায় ফলশ্রুতিতে উৎপাদন সঠিক থাকে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (Primary health care system) : দুধালো মহিষকে সুস্থ রাখতে হলে সঠিক পুষ্টি প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে। মাঠ পর্যায়ে মহিষের গলাফোলা রোগ বেশি দেখা যায়। তবে ক্ষুরা, বাদলা, তড়কা রোগও দেখা যায়। এজন্য এসব রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। নিম্নলিখিত টিকা প্রদানের মাধ্যমে দুধালো মহিষকে উক্ত রোগসমূহ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

প্রাণীর বয়স	টিকার নাম	বিবরণ
১.৫ মাস	ক্ষুরা	প্রতি ৬ মাস অন্তর
৬ মাস	বাদলা	বছরে ১ বার (২ বছর পর্যন্ত)
৬ মাস	তড়কা	বছরে ১ বার
৬ মাস	গলা ফোলা	বছরে ১ বার

এছাড়াও মাসে একবার ০.৫% ম্যালাথিয়ন মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করালে বহিঃপরজীবী দমন সম্ভব। প্রতি ৪-৬ মাস অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে। তবে দুধালো মহিষকে কৃমির ঔষধ প্রদান করলে প্রথম ৩-৫ দিন দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং এ সময়ে উক্ত দুধ পান না করা ভালো। এজন্য দুধালো অবস্থায় কৃমির ঔষধ না প্রয়োগ করে শুষ্ক অবস্থায় কৃমির ঔষধ প্রদান করা ভালো।

দুধালো মহিষকে ওলান ফুলা রোগের (Mastitis) হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ওলান ফুলা রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে (Sub-clinical mastitis) এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়না, অথচ দুধ উৎপাদন ১৫-৪৫% পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এজন্য দুধ দোহনের পূর্বে গোয়ালাকে পরিষ্কারভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত দুধ উৎপাদন (Hygienic milk production) : স্বাস্থ্যসম্মত দুধ বোঝাতে পরিষ্কার, প্রাকৃতিক গন্ধ বিশিষ্ট, কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ব্যাকটেরিয়াযুক্ত, সঠিক রাসায়নিক গঠন বিশিষ্ট দুধকে বোঝায়। প্রাণীর সুস্থ ও পরিষ্কার স্বাস্থ্য রক্ষাই হলো নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুধ উৎপাদনের মূলকথা। ওলান ফুলা (Mastitis), যক্ষা (Tuberculosis) এবং ব্রুসলোসিস (Brucellosis) রোগ থেকে দুধের মহিষকে মুক্ত রাখতে হবে। শেষোক্ত রোগ দুটি দুধের মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। ওলান ফুলা রোগের নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নোংরা ও অপরিষ্কার ঘরের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। এজন্য প্রতিদিন কাদামাটি, গোবর, মূত্র ও খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ঘর হতে পরিষ্কার করতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মহিষের শরীর ধৌতকরণ (Washing), দলাই-মলাই (Grooming) করার মাধ্যমে দুধ ময়লা ও পশম মুক্ত রাখা যায়। হাত/ওলান/দুধের পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে দুধ দোহন শুরু করতে হবে। দুধ দোহনের জন্য বাচ্চা দুধের বাঁট চুষতে শুরু করার ২-৫ মিনিটের মধ্যে দুধ নিঃসরণ শুরু হয়। দুধ নিঃসরণের সাথে সাথে গোয়ালাকে দুধ দোহন কার্যক্রম শুরু করতে হবে । দুধ দোহনের পর শুকনো সূতি কাপড় দিয়ে এন্টিসেপটিক দ্রবণের (ডেটল/স্যাভলন) মাধ্যমে ওলান মুছতে হবে। দুধ দোহনের আগে ও পরে দুগ্ধ যন্ত্রপাতি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে। দুধ দোহনের জায়গা সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। দোহনের পর মহিষ যেন বসে না পড়ে এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এজন্য দোহনের পর মহিষকে আঁশজাতীয়/দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে। পচা-বাসি খাবার সরবরাহ করা যাবে না।

এসডিজি-২০৩০ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী দেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ করতে হবে (ডিএলএস, ২০১৮)। প্রাণী সম্পদের অন্যতম উপাদান হিসেবে দুধের গুরুত্ব অপরিসীম। দুধ উৎপাদনে মহিষ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশে এ প্রজাতিটি অবহেলিত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে দেশে প্রায় ১৪.৯৩ লক্ষ মহিষ রয়েছে। এসব মহিষের শতকরা ৪ ভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে, ৩২ ভাগ সমতল ভূমিতে, ১৩ ভাগ জলাভূমিতে এবং এক ভাগ পার্বত্য অঞ্চলে পালন করা হয়। এসব অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিষগুলো ছেড়ে দিয়ে অথবা অর্ধ ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশে অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান এবং মহিষ পালনে অগ্রগামী দেশসমূহ মহিষ আবদ্ধপদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে পালন করে। আর এসব দেশে মোট দুধ উৎপাদনের ৫০ থেকে ৬৫ ভাগ আসে মহিষ থেকে। আমাদের দেশে মহিষ থেকে দুধ আসে মাত্র ৪ শতাংশ। মহিষ থেকে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারলে অতি সহজেই আমরা দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি।

লেখক : জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ। ই-মেইল ঃ smrajiurrahman@yahoo.com; মোবাইল : ০১৭১৭৯৭৯৬৯৭

পুষ্টিগুণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় তালগাছ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সাইফুল আলম সরকার

তাল বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ফলজ বৃক্ষ। এটি পাম গোত্রের অন্তর্গত একটি উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Borassus flabellifer*। ভাদ্র মাসে পাকা তালের রস দিয়ে বিভিন্ন মুখরোচক পিঠা তৈরি আবহমান বাংলার চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। তালগাছ থেকে উৎপন্ন কচি ও পাকা ফল, তালের রস ও গুড়, পাতা, কাণ্ড সবই আমাদের জন্য উপকারী । কচি তালবীজ সাধারণত তালশাঁস নামে পরিচিত যা বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান ও ভিটামিনে পরিপূর্ণ। মিষ্টি স্বাদের কচি তালের শাঁস শুধু খেতেই সুস্বাদু নয় বরং পুষ্টিতে ও ভরপুর। শরীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়া এই তাল শাঁসের পুষ্টিগুণের পরিমাণ সারণি দ্রষ্টব্য।

সারণি : প্রতি ১০০ গ্রাম তালের শাঁসে পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ	৮৭.৬ গ্রাম
আমিষ	০.৮ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	১০.৯ গ্রাম
খাদ্য আঁশ	১.০ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	২৭ মিলিগ্রাম
ফসফরাস	৩০ মিলিগ্রাম
আয়রন	১.০ মিলিগ্রাম
থায়ামিন	০.০৪ মিলিগ্রাম
রিবোফ্লাভিন	০.০২ মিলিগ্রাম
নিয়াসিন	০.৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি	৫ মিলিগ্রাম

এ সব পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরকে নানা রোগ থেকে রক্ষা করাসহ রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। যেমন :

- তালের শাঁসে প্রায় ৯৩% বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোলাইট সমৃদ্ধ পানি ও প্রাকৃতিক জিলেটিন থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে পরিশ্রান্ত কর্মজীবী মানুষেরা তালের শাঁস খেলে দেহকোষে অতিদ্রুত ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সের মাধ্যমে শরীরে পুনরুদন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং আমাদের শরীরকে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা দূর করে প্রাকৃতিকভাবে ক্লান্তিহীন রাখে । এ কারণে তালের শাঁসকে অনেক পুষ্টিবিদ প্রাকৃতিক শীতলীকারকও বলে থাকেন।
- অতিরিক্ত রোদে ও গরমের কারণে ত্বকে বিভিন্ন র‍্যাশ বা এলার্জিতে দেখা দিলে তালের শাঁস মুখে লাগাতে পারেন। তাছাড়া সানবার্ন থেকে মুক্তি পেতে তালের শাঁসের খোসা ব্যবহার করা যায়।
- কচি তালের শাঁসে থাকা ভিটামিন সি ও বি কমপ্লেক্স আপনার পানি পানের তৃপ্তি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়, বমিভাব দূর করে, খাওয়ার রুচি বাড়ায়। তাছাড়া লিভারজনিত বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও তালের শাঁস বেশ কার্যকর।
- তালের শাঁসের গাইসেমিক ইনডেক্স অনেক কম (৩৫%) হওয়ায় ডায়বেটিস রোগীর জন্য এটি একটি চমকপ্রদ খাদ্য উপাদান। অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি খাবেন এ নিয়ে যারা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তারাও অনায়েসে খাদ্য তালিকায় তালের শাঁস রাখতে পারেন কেনানা এটি তুলনামুলক কম ক্যালরিযুক্ত একটি খাবার। তালের শাঁস অধিক আঁশসমৃদ্ধ হওয়ায় যারা কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অন্যান্য পেটের পীড়ায় ভুগছেন তালেরশাঁস হতে পারে তাদের জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত এক ঔষধ।
- এতে থাকা ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট ও অন্যান্য খনিজ উপাদান হাড় ক্ষয়, উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত স্বল্পতা ও ক্যান্সারসহ নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় বেশ উপকারী ভূমিকা পালন করে।

খেজুর গুড়ের ন্যায় তালের রস জ্বাল দিয়ে তৈরিকৃত তালমিছরিও আমাদের দেশে অতি পরিচিত একটি খাদ্য উপকরণ, যা সাধারণত বিভন্ন অসুখবিসুখে পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তালমিছরি গুণাগুণ বর্ণনা করতে গেলে প্রথমত এর পুষ্টিগুণ বিবেচনা করতে হয়। এতে রয়েছে ভিটামিন বি১, বি২, বি৩, বি৬ বি১২, ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক ও ফসফরাস। সর্দি-কাশি, রক্তস্বল্পতা ও পেটের পীড়াসহ নানাবিদ রোগের চিকিৎসায় এটি বেশ কার্যকর। যাদের ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগার ভয় রয়েছে বিশেষত কাশি, গলায় জমে থাকা কফ, শ্লেষ্মা দূর করতে হালকা গরম পানিতে গোলমরিচ গুঁড়া ও তালমিছরি গুলে খাওয়ালে বেশ উপকার হয়। তাছাড়া তুলসী পাতার রসের সাথে তালমিছরি গুলে খেলে পুরানো সর্দি-কাশি অতি দ্রুত নিরাময় হয়। চিনির তুলনায় গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশ কম হওয়ায় ডায়াবেটিক রোগীর পাশাপাশি সব বয়সের মানুষের জন্য চিনির বিকল্প হিসেবে এটি বেশ নিরাপদ। মিছরি ক্যালসিয়াম ও আয়রনসমৃদ্ধ হওয়ায় হাড় ক্ষয় ও রক্তস্বল্পতায় ভুগা রোগীরা খাদ্য তালিকায় মিছরি রাখতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা ও অনায়াসে মিছরি খেতে পারেন কেননা মিছরিতে রয়েছে অধিক পরিমাণে পটাশিয়াম এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী সোডিয়াম প্রায় নেই বললেই চলে।

এ ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজেই তালগাছ আমাদের নিত্য অনুষঙ্গ। তালগাছের কাঠ মূলত ঘরের খুঁটি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে

তালগাছের নৌকা বিশেষত হাওর অঞ্চলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূর্বেকার দিনের বিভিন্ন ধর্মীয় ও অন্যান্য পুস্তক মূলত তালপাতাতেই লেখা হতো। গ্রামেগঞ্জে এখনও তালপাতার হাতপাখার রয়েছে বিশেষ কদর। তাছাড়া, তালপাতা জ্বালানির পাশাপাশি, মাদুর, ঘর ছাউনি ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনে কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বত্র অধিকহারে তাল গাছ রোপণ এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বজ্রপাতের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে ২০০০-২৪০০ জন মানুষ বজ্রপাতের কারণে মারা যায় এবং ৫০ হাজারেরও অধিক মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়। বাংলাদেশে ২০১৬ সালে মে মাসে মাত্র একদিনের ব্যবধানে ৮২ জনসহ সর্বমোট ৪৫০ মানুষের মৃত্যু বজ্রপাতের ভয়াবহতার চিত্র করুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, ২০১৭ সালে বজ্রপাতের কারণে প্রায় ৩০৭ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটে যা ২০১৫ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। সরকারি তথ্যমতে, বজ্রপাতের কারণে প্রতিনিয়তিই মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে, যেমন, ২০১৮ সালে ব্রজপাতের কারণে মৃত্যুর এ সংখ্যা ছিল ৩৫৯। ব্রজপাতের কারণে এই হতাহতের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হাওরাঞ্চলে। মাত্রাতিরিক্ত বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুঝুঁকির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এর প্রতিকারে করণীয় নির্ধারণে তৎপর হয়। বজ্রপাতের কারণে অতি উচ্চ ভোল্টেজসম্পন্ন বিদ্যুৎ সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে উচু স্থাপনা বা বস্তুতে আঘাত হানে। এজন্য পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদগণ পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ করে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য অধিকহারে তালগাছ রোপণের উপর গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন। তালগাছ সাধারণত ৩০ মিটার (৯৮ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি বজ্রপাতে সৃষ্ট অতি উচ্চ ভোল্টেজ সম্পন্ন বিদুৎ পরিবহন করে মাটিতে পৌছে দিয়ে বজ্রাহতের হাত থেকে রক্ষা করে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার ইতোমধ্যে সারা দেশব্যাপী কয়েক মিলিয়ন তালগাছ রোপণও করেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তালগাছ

তাছাড়া, ভাঙ্গন ও মাটি ক্ষয়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়ও তালগাছের জুড়ি মেলা ভার। তালগাছ গুচ্ছমূলীয় হওয়ার কারণে নদীর ভাঙ্গন ও মাটির ক্ষয়রোধে এর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে ভারত থেকে প্রবল স্রোতে নেমে আসা উজানের পানির কারণে সৃষ্ট বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ভাঙ্গনের কবলে জর্জরিত রাস্তা ও বেড়ি বাধ বন্যা পরবর্তী যোগাযোগক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুর্যোগের সৃষ্টি করে । প্রতি বছরই এই সব অঞ্চলে রাস্তা ও বাধ পুন:নির্মাণে জন্য মোটা অংকের রাজস্ব ব্যয় হয়। এ সমস্ত বন্যাপ্রবণ এলাকার রাস্তা ও বাধের দুই পাশে তালগাছ রোপণ করে ভাঙ্গনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এই বছর সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরপর দুইবার ঘটে যাওয়া নজিরবিহীন বন্যায় রাস্তাঘাটের ভাঙ্গন অধিকহারে তালগাছ রোপণের গুরুত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তালগাছের জন্য তেমন বিশেষ কোন পরিচর্যারও প্রয়োজন হয় না।

এ জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বজ্রপাত, বন্যাসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারের পাশাপাশি সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে আমাদের সকলকে পরিবেশবান্ধব এই বৃক্ষ রোপণে সচেষ্ট হতে হবে।

লেখক : বিজ্ঞানী (ফলিত গবেষণা), পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। ইমেইল : saiful.barj@gmail.com; মোবাইল: +৮৮০১৬৯০-০৫৭৫৭৭

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির স্বার্থে মিলিং ব্যবস্থাপনার জনসচেতনতা

মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ধান উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশের জলবায়ু মাটি ও পানি ধান চাষের জন্য উপযোগী। একসময় এদেশে অসংখ্য জাতের ধানের আবাদ ছিল। উচ্চফলনশীল জাতের আবির্ভাব হওয়ায় স্থানীয় মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত আদি জাতসমূহের বিলুপ্তি ঘটেছে। স্থানীয় জাতের ধানের উৎপাদন ক্ষমতা কম কিন্তু উৎপাদনকাল বেশি ছিল। তবে পুষ্টিগুণ ছিল অধিক। বর্তমানে যে সকল ধানের চাষাবাদ করা হয় এদের উৎপাদনে সময় কম লাগছে কিন্তু ফলন বেশি হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা বিবেচনায় উচ্চফলনশীল ধানের জাতের পর হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদের দিকেও ঝুঁকছে এদেশের কৃষক। প্রযুক্তির আশীর্বাদ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। নতুবা দেশে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হবে, মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি রক্ষাই হলো সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারনে অধিক ধান উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে। কিন্তু সরকারিভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক মিলিং ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ নির্দেশনার অনুপস্থিতির কারণে আধুনিক চালকলের অতিরিক্ত পলিশিং ব্যবস্থায় চালের পুষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। পলিশবিহীন পূর্ণচাল পুষ্টিমানসমৃদ্ধ কিন্তু দেখতে আকর্ষণীয় নয়। অনেকটা ঘোলা বা বাদামি ধরনের। তাই এই চালের বাজারদর নিম্ন এবং চাহিদা কম। অতিরিক্ত পলিশিং ব্যবস্থায় চালের উপরের বাদামিস্তর চলে যাচ্ছে এবং স্বচ্ছ ও সিল্কি চাল তৈরি হচ্ছে। এ সিল্কি চাল আকর্ষনীয় ও বাজারে এর চাহিদাও বেশি। সেইসাথে দামও অধিক অথচ বাদামি চালের পুষ্টির তুলনায় স্বচ্ছ চালের পুষ্টিমান অনেক কম। স্বচ্ছ ও সিল্কি চালে কার্বোহাড্রেট বেশি থাকে তাই ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাজারে যে চাল পাওয়া যায় তা ১০ শতাংশেরও অধিক পলিশিংযুক্ত। এই অতিরিক্ত পলিশিংয়ের কারণে প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ লাখ মেট্রিকটন চালের অপচয় হচ্ছে। পলিশিং যদি ৫% এ সীমাবদ্ধ রাখা যায় তবে ২৫ লাখ মেট্রিক টন চালের সাশ্রয় হবে। অধিক মাত্রায় পলিশিংয়ের কারণে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে ও বৈদেশিক উৎস হতে মিলিয়ন মেট্রিক টন চাল ও গম আমদনি করতে হচ্ছে অথচ চালকলের পলিশিং ব্যবস্থার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে এই অপচয় রোধসহ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উভয়টিই নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে অভ্যন্তরীণভাবে দেশে খাদ্যর চাহিদা পূরণ এবং বাজারের দরের স্থিতিশীলতা আসবে। বাজারদর স্থিতিশীল থাকলে সকল শ্রেণীর মানুষের খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্যও উন্নত হবে। যেহেতু কম পলিশযুক্ত চাল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ফাইবারযুক্ত, তাই পূর্ণচাল ভোগে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে। অপুষ্টিজনিত রোগবালাই কমবে এবং স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি ও এখাতে ব্যয় হ্রাস পাবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত পলিশিংয়ের কারণে চালের স্থায়িত্বও কমে যায়। বাজারে কিছু একসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ চাল দেখা যায় যেগুলোর পেট সাদা। এসব চাল একসিদ্ধ বলা হলেও পুরোপুরি একসিদ্ধও নয়। এসকল চাল দ্রুত ভেঙে যায় এবং স্থায়িত্ব কমে যায়। যার কারণে চালের অপচয় হয়। তাই চাল হতে হবে পুরোপুরি সিদ্ধ নতুবা সিদ্ধহীন আতপ। ধান হতে চাল তৈরিতে কখনো দুই সিদ্ধ আবার কখনো একসিদ্ধ করা হয়। ধানকে যখন সিদ্ধ করা হয় তখন চালের উপরের পুষ্টিযুক্ত স্তর হতে কিছু পুষ্টি চালের ভিতরের স্তরে পৌঁছে যায়। এ কারণে

অতিরিক্ত পলিশিংয়ের কারণে প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ লাখ মেট্রিকটন চালের অপচয় হচ্ছে। পলিশিং যদি ৫% এ সীমাবদ্ধ রাখা যায় তবে ২৫ লাখ মেট্রিক টন চালের সাশ্রয় হবে

আতপের তুলনা সিদ্ধ চালের পুষ্টিমান তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। একই কারণে একসিদ্ধ চালের তুলনায় দুইসিদ্ধ চাল বেশি পুষ্টিমানসমৃদ্ধ।

আধুনিক মিলিং ব্যবস্থা মূলত বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়। যার কারণে সয়ংক্রিয়ভাবে এসব মিলে চাল শুকানো, সিদ্ধকরণ, মিলিং করা, মরা ও ভাঙা দানা পৃথকীকরণসহ চাল বহির্ভূত অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থ আলাদাকরণ করা সম্ভব হচ্ছে। ধান হতে চাল তৈরির জন্য প্রাকৃতিকভাবে অনুকূল পরিবেশের জন্য আগের মতো অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিতে ধান ভিজে নষ্ট হওয়া হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে অটোমেটিক মিলিং ব্যবস্থার ধান হতে চাল তৈরিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার প্রভাব থাকছে না বিধায় দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ছে, চালের গুণগতমানও অক্ষুণ্ন থাকছে। সেইসাথে কাঙ্ক্ষিত মানের চাল তৈরি ও ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

আগের ভোক্তা পর্যায়ে মরা দানা, ভাঙা দানা ও অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থ চাল হতে পৃথক করতে হতো। পূর্বে হলারের মধ্যমে যে মিলিং হতো তাতে নির্দিষ্ট জাতের বা ধরনের চাল পৃথক করে রাখা সম্ভব হতো। বর্তমানে বড় মিলে সেটি আর সম্ভব নয় বলেই অনুমেয়। কারণ মেজর বা অটোমেটিক চালকলে বেশ কয়েক টন ধান একইসাথে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এ ধান অসংখ্য কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেই ফরিয়ার মাধ্যমে চালকলে আনা হয়। তাই এতে বিভিন্ন জাতের ধান থাকাই স্বাভাবিক। সে কারণে বাজারে চালের বস্তায় যে ধরনের চাল বলে উল্লেখ করা হয়, সেটি অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থ নয়। তবে নির্দিষ্ট কিছু উচ্চমূল্যের সরু বা পোলাউর চালে স্বকীয়তা বজায় থাকে। মূলত বিভিন্ন জাতের ধান একই চাল কলে মিলিংয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয় এবং মিলার ধান হতে চাল তৈরি করে ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী নামকরণ করেন। এ সমস্যা সমাধানে জোনভিত্তিক নির্দিষ্ট জাতের ধানের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে। জোনভিত্তিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থা গৃহীত হলে একদিকে উৎপাদন বাড়বে কারণ ওই এলাকার উপযোগী অধিক উৎপাদনশীল ধান উৎপাদনের জন্য বিবেচিত হবে। সেইসাথে মিলার নির্ধারিত জাতের ধান সংগ্রহ, মিলিং ও এর যথাযথ লেভেলিং বা বস্তায় স্টেনসিলের মাধ্যমে তা বাজারজাত করতে সক্ষম হবেন।

ধানের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। যার মধ্যে হাস্ক বা তুস সর্ব-উপরের স্তর, এটি প্রায় ধানের ২০ শতাংশ। এ ছাড়া তুসের নিচের লাল স্তর বা কুড়া যা ৮-১২ শতাংশ। আর মিল রাইছ বা সাদা চাল হলো প্রায় ৬৮-৭২ শতাংশ। মূল চালের উপরের স্তরের ১০-১৫ শতাংশ ফেলে দিয়ে আধুনিক চাল কলের পলিশিং ব্যবস্থায় পৃথক করে সরু ও সাদা চাল তৈরি করা হচ্ছে। আধুনিক মিলিং প্রযুক্তি চালুর পূর্বে মানুষ ঢেঁকিছাঁটা চাল খেতো। ঢেঁকিছাঁটা চাল ছিল লাল কারণ চালের উপরের লাল স্তর এতে অক্ষুণ্ন থাকত। চালের উপরের লাল স্তরে তেল ও পুষ্টি থাকে। ঢেঁকিছাঁটা ব্যবস্থার পরবর্তী সংস্করণ হলো হলারের মাধ্যমে ধান ছাটাই। এ মেশিনে উৎপাদিত চালের লাল স্তরের অস্তিত্ব পুরোপুরি না থাকলেও আংশিক বজায় থাকে। সেইসাথে চালের উপরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় চালে পুষ্টি ও ফাইবার দুটোই অক্ষুণ্ন থাকে। বর্তমানে মেজর বা অটোমেটিক রাইছ মিল চালু হয়েছে, তাতে চালের উপরের লাল স্তরতো থাকেই না বরং মূল চালের উপরের পুষ্টিযুক্ত স্তরটিও পলিশিং করে পৃথক করা হয়। দেশের মানুষের সরু চালের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা বাড়ছে। এছাড়া বর্তমান প্রজন্ম সাদা চালের সাদা ভাত খেতে পছন্দ করে। ফলে তারা চালের স্বাভাবিক পুষ্টি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণেই বর্তমানে শিশুদের মাঝে ডায়াবেটিস, দৃষ্টিহীনতা ও অপুষ্টি, কোষ্ঠকাঠিণ্যতাসহ বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি বাসা বাঁধছে। তাই বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষায় এবং সুস্থসবল কর্মক্ষম জাতিগঠনে চালের পুষ্টি যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেজন্য যথাযথ মিলিং ও বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশের মানুষ ভাতের মার ফেলে দেয় ভাতকে ঝরঝরা রাখার জন্য। অথচ ভাতের মার ফেলে দেওয়ার কারণে অনেক পুষ্টি হারিয়ে যায়। এছাড়া চাল অতিরিক্ত ধৌত করার কারণেও চালের পুষ্টিমান ক্ষুণ্ন হয়। মিলে বা চালকলে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার চাল তৈরি ও ভোক্তা সাধারণ কর্তৃক সাদা ঝরঝরে ভাত গ্রহণের কারণে একদিকে চালের ঘাটতি ও আমদানি নির্ভরতা বাড়ছে, অপরদিকে পুষ্টিহীন চাল গ্রহণ করে এদেশের মানুষ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে এবং চালের অপচয় রোধকল্পে দক্ষিণ কোরিয়াতে একসময় চালের পলিশিং নিষিদ্ধ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও মাত্র ৫% পলিশিং করা হয়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আমাদের এই দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে আমাদের প্রয়োজন আশু মিলিং ব্যবস্থাপনা ও জনসচেতনতা। একদিকে সজ্ঞানে চালকে অতিরিক্ত পলিশিং করে পুষ্টিহীন করা হচ্ছে অপরদিকে বিদেশ হতে ভিটমিন ও মিনারেলযুক্ত কেমিকেল কিনে তা দিয়ে কৃত্রিমভাবে চাল তৈরি করে বিদ্যমান চালের সাথে মিশিয়ে দেশের গরিব মানুষের পুষ্টি পূরণের চেষ্টা চলছে। যা দেশি ও বিদেশী অর্থের অপচয় হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তোরনে আমাদের প্রয়োজন যুগপযোগী মিলিং ব্যবস্থাপনা ও জনসচেতনতা। মিলারগণ যাতে নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক চাল পলিশিং করতে না পারেন এবং ক্রেতারাও যেন বেশি দামে পুষ্টিহীন চাল ক্রয় করে প্রতারিত না হন সেলক্ষ্যে আশু মিলিং ব্যবস্থাপনা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

লেখক : অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
মোবাইল : ০১৫৫২৩৫৫৮৫৩, ই-মেইল : kawsaru11173@gmail.com

তুলা চাষে অনন্য সুবিধা ও সম্ভাবনা

অসীম চন্দ্র শিকদার

উঁচু, সমতল, সুনিষ্কাশিত জমি অর্থাৎ বর্ষার জল উঠেনা, বৃষ্টি জল দাড়ায়না, হালকা সেচের সুবিধা আছে, মাটির প্রকৃতি দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ যুক্ত হয়, আর কমপক্ষে ২/৩ বিঘা এমন জমি থাকে তবে অবশ্যই এক দেড় বিঘা জমিতে তুলা চাষ করা সম্ভব। যারা জমিতে বছরে একটি বা দু'টির বেশি ফসল ফলাতে চান না, আবার লাভজন ফসল চাষের কথা ভাবছেন তারা অবশ্যই তুলা চাষ করবেন এবং লাভবান হবেন। কারণ বর্তমানে সিবি-১২সিবি ১৪ সিবি ১৮ প্রভৃতি জাতের তুলা চাষ করে বিঘা প্রতি গড়ে ১২ থেকে ১৫ মন আর হাইব্রিড জাতের তুলা চাষ করে বিঘা প্রতি ১৫ থেকে ২০মন বীজ তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে, যার বাজার দর বর্তমানে মন প্রতি (৪০ কেজি) ৩৬,০০.০০ টাকা হিসেবে ৪৩,২০০.০০ টাকা থেকে ৫৪,০০.০০ টাকা এবং ৫৪,০০.০০ টাকা থেকে ৭২০০০ টাকার মত। সুতরাং যথেষ্ট লাভজনক।

পরিপক্ব ফুটন্ত তুলার মনোহারি দৃশ্য

তুলা চাষে অন্যান্য সুবিধা ও সম্ভাবনা : তুলা ফসলের উৎপাদনকাল ৫ থেকে ৬ মাস। তাই একক ফসল হিসেবে তুলা চাষ বর্তমানে যথেষ্ট লাভজনক। তবে তুলা ফসল উঠার পর অঞ্চল ভেদে আর একটি ফসল যেমন গ্রীষ্মকালিন মুগ, তিল, পাট, বীজের জন্য বাদাম ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব। প্রচলিত পাট চাষ আর বর্তমানে গ্রীষ্মকালিন মুগ এবং তিল চাষ এখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। আবার তুলা ফসলের সাথে সাথী ফসল চাষের সুযোগও আছে। যেহেতু তুলার সাড়ি থেকে সাড়ি কমপক্ষে তিন ফুট (৯০ সেমি.) থাকে তাই মাঝের ফাকা জায়গা থেকে সহজেই এক/দুই মাসের মধ্যে সবজি এবং শাক জাতীয় বিভিন্ন ফসলের চাষ করা যায়। সাথী ফসলের আয় থেকে তুলা চাষের উৎপাদন খরচের অনেকটাই পুরণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একসারি অন্তর অন্তর সাথী ফসলের চাষ করতে হবে ; যাতে তুলা ফসলের পরিচর্যায় কোন সমস্যা না হয়। এছাড়া সয়াবীন সীম জাতীয় ফসল বিধায় এটি তুলার সাথে খাদ্যের প্রতিযোগিতা করে না। তুলা বীজ থেকে ১৫ থেকে ২০ ভাগ উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ তেল পাওয়া যায় যা সয়াবিন তেলের চেয়েও পুষ্টিকর। বর্তমানে ভোজ্য তেলের সমস্যায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া তুলা বীজের খৈলে রয়েছে ২৪ শতাংশ প্রোটিন, আর ২০ শতাংশ ফ্যাট, যা গবাদীপশু ও মৎস্য খাদ্যের জন্য উৎকৃষ্ট।

তুলা বীজের গায়ে লেগে থাকা ফাঁজ ডাক্তারি কাজে ব্যবহার করা হয়। তুলা গাছ জ্বালানির একটি ভালো উৎস। তুলা গাছের পাতা মাটিতে পরে মাটিকে জৈব সারের যোগান দেয়, এছাড়া মাটির উপরিভাগের সার তুলা গাছ ব্যবহার করে না। বিধায় তুলা ফসলের পরের ফসলে তেমন সার প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দুরত্বের হিসেবে তুলা চাষে সম্পূর্ণ জমি ব্যবহৃতও হয় না।

তুলা চাষের সময় ও ব্যবস্থাপনা : শ্রাবণ মাস (জুলাই-১৫ থেকে আগষ্ট-১৫) তুলা চাষের উপযুক্ত সময়। তবে অঞ্চল ভেদে তারতম্য হতে পারে। অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে শীত আগে আসে সেই সব অঞ্চলে আষাঢ়ের ১৫ হতেই চাষ আরম্ভ করতে হবে এবং শ্রাবনের ১৫ তারিখের মধ্যে চাষের কাজ শেষ করতে হবে। তবে ঢাকা অঞ্চলে ভাদ্রমাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত তুলা চাষ করা যায়। নাবি তুলা চাষ হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যা অবশ্যই করতে হবে।

লাইন থেকে লাইনের এবং বীজ থেকে বীজের দুরত্ব কিছুটা কম করে জমিতে চারার সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যারা পাট চাষের পর তুলা চাষ করবেন তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য। বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে প্রথম ফুলটি গাছে ফোটাতে পারলে মনে করবেন সঠিক পরিচর্যা করা হয়েছে।

জমি তৈরি : প্রথমে জমি গভীর ভাবে চাষ করে ঝুর ঝুর করে নিতে হবে। কেন না তুলার শিকড় মাটির অনেক গভীরে যায়। সাধারণতঃ তুলা বীজ বপন করতে হয় লাইন থেকে লাইন তিন ফিট (৯০ সেমিঃ) এবং বীজ থেকে বীজর প্রায় এক ফুট (৩০-৩৫ সেমিঃ) দুরে দুরে। তবে জমির উর্বরা শক্তির ভিত্তিতে তুলা ফসলের লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব কম বেশি করা যেতে পারে। অবশ্য এখন তুলা গাছ খর্বাকৃতি রাখার জন্য মেপাকুয়েট ক্লোরাইড (PGR) ব্যবহার করা হচ্ছে।

সার ব্যবস্থাপনা : জৈবসার তুলা চাষের জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। গোবর সার, মুরগির লিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ

লিটার নতুন অবস্থায় সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যাবে না। এটিকে অন্তত ছয় মাস মাটিতে গর্ত করে নীচে পলিথিন বিছিয়ে তার মধ্যে রেখে উপরে পলিথিন দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। পরে চাষের সময় সেই সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এ সার খুবই শক্তিশালী।

এ সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করলেও চলে। শুধু পটাশ ও টিএসপি প্রয়োগ করতে হয়; তাও পরিমাণে অর্ধেক ব্যবহার করলেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া আরও বেশি ফলনের জন্য ভার্মীকম্পোস্ট, কম্পোস্ট সার, সবুজ সার প্রয়োগ প্রয়োগও করা হচ্ছে। তবে ফলিয়ার স্প্রে তুলা ফসলের জন্য বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ, বিশেষ করে পটাশ এবং বোরন। এটি প্রতিবার কীটনাশকের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে আরও ভাল হয়।

তুলা ফসলে পোকামাকড় দমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাল ফলনের জন্য আইপিএম এর ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া ফেরোমন ফাঁদের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে তুলার উৎপাদন খরচ অনেকটাই কমেছে। তুলা এখন আর শুধু কৃষক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই, শিল্প পতিরাও তুলা চাষে এগিয়ে এসেছে। যেমন ফিনিক্স পলট্রি, প্যারাগন পলট্রি, গিভেন্সী কটন মিল, ওটা কটন মিল, পারটেক্স গ্রুপও জমি ক্রয়ের পর পর লাভজনক ভাবে তুলা চাষ করেছে।

তুলা ফসলের বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু সবজি বা অন্যান্য ফসলের চাষে সেটা নেই। যাদের তুলা চাষের উপযুক্ত জমি আছে তাদের উচিত তুলা চাষের মৌসুম, কাল বিলম্ব না করে এখনই চাষি ভাইরা নিকটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অফিসে যোগাযোগ করুণ এবং তুলা চাষ করে নিজে লাভবান হন। সেই সাথে দেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে এবং ভোজ্য তেল উৎপাদনে অবদান রাখুন।

লেখক : ডিপ্লোমা কৃষিবিদ (অব.), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মোবাইল : ০১৫৫২-৩৬২৯০১, ই-মেইল : asim.cdb@gmail.com. ১০৪/১ (বি-২), শের-এ-বাংলা রোড, রায়ের বাজার, জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর-১২০৭।

পাওয়ার স্প্রেয়ারের সাহায্যে তুলার পোকা দমন (ফিনিক্স পলট্রি)

বাঘের বাজার ফিনিক্স পলট্রিতে তুলা চাষ

তুলা বীজ বপন

তুলা ফসলের মাঝে ফাঁকা জায়গায় সাথী ফসল চাষ

রকমেলন চাষে সফলতা পেয়েছেন রূপসার ক্ষিতিষ বৈরাগী

মোঃ আবদুর রহমান

রকমেলন মরু অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় ফল। সৌদি আরবে এ ফলকে 'সাম্মাম' বলে। এ ফলের ওপরের ত্বক পাথর (Rock) এর মতো, তাই অস্ট্রেলিয়ায় একে 'রকমেলন' বলা হয়। কোনো কোনো দেশে এটি খরমুজ, খরবুজ, ক্যান্টালোপ, সুইট মেলন, মাস্ক মেলন, হানিডিউ মেলন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রকমেলন বেশ জনপ্রিয়।

মরুভূমির জনপ্রিয় ফল রকমেলন চাষ করে প্রথমবারই সফল হয়েছেন আদর্শ কৃষক ক্ষিতিষ বৈরাগী (৪৮)। তিনি রূপসা উপজেলার ডোবা গ্রামের বাসিন্দা। ঘেরের পাড়ে উচ্চমূল্যের এ ফল চাষ করে স্বল্প সময়ে অধিক ফলন ও ভালো দাম পেয়ে ক্ষিতিষ বৈরাগী দারুণ খুশি। তার এমন সাফল্য দেখে এলাকার আরো অনেক চাষি রকমেলন ফল চাষে উৎসাহিত হয়েছেন।

সরেজমিন জমিতে গিয়ে দেখা যায়, ঘেরের পাড়ে মাচায় ঝুলছে নানা রঙের ছোট-বড় রকমেলন ফল। আবার কোনো কোনো গাছে ফুটেছে ফুল। পুরো জমিটি সবুজে ঘেরা। ক্ষেতে রকমেলন গাছের পরিচর্যা করছেন ক্ষিতিষ বৈরাগী। এ সময় তার সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, গত বছর ভারতের দিল্লি শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে রকমেলন ফল খেয়ে দারুণ তৃপ্তি পেয়ে নতুন এ ফল চাষে তার ইচ্ছে জাগে। সেই ইচ্ছে বাস্তবে রূপ দিতে দেশে ফিরে তিনি এ বছর মৎস্য ঘেরের পাড়ে ১০ শতক জমিতে রকমেলন চাষ করেন।

ক্ষিতিষ বৈরাগী আরো বলেন, বর্ষায় পানিতে ডুবে না যায় এ ধরনের উঁচু ঘেরের পাড়ের বেলে দো-আঁশ মাটি এ ফল চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। ঘেরের পাড়ে ২ হাত দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ হাত পর পর ২০ সেমি. চওড়া ও ২০ সেমি. গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপর প্রতি মাদার ওপরের স্তরের মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম পঁচা গোবর, ২০ গ্রাম টিএসপি, ১৫ গ্রাম এমওপি ও ৫ গ্রাম ব্রিফার-৫ জি (দানাদার কীটনাশক) ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা পুনরায় ভরাট করতে হবে। ঘেরে পাড়ের দুই পাশে মাদা তৈরি করতে হয়। মাদায় সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি অংকুরিত বীজ ১ইঞ্চি (২.৫ সেমি.) গভীরে বপন করা হয়। বীজ বপনের সময় শীত আসার পূর্বে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর (ভাদ্র-কার্তিক) অথবা মার্চ থেকে জুন (ফাল্গুন-আষাঢ়)। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

তিনি বলেন, রকমেলনের ভালো ফলনের জন্য ইউরিয়া ও এমওপি সার তিন ভাগে ভাগ করে চারা গজানোর ১৫ দিন পর প্রথম, ৩০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৫০ দিন পর তৃতীয় কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কিস্তিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১৫ সেমি. দূরে চারদিকে উপরিপ্রয়োগ করে ঝুরঝুরে শুকনো মাটি দিয়ে এ সার ঢেকে দেওয়া হয়। প্রতিবার সার উপরিপ্রয়োগের পর মাদায় ঝাঝরি দিয়ে পানি সেচ দিতে হয়। তাছাড়া মাটিতে রসের অভাব হলে রকমেলন গাছে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে চারা গাছ অতিবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারে না। আবার গাছের গোড়ায় আগাছা হলে নিয়মিত নিড়ানি দিয়ে তা তুলে ফেলতে হয়। ক্ষিতিষ বৈরাগী বলেন, রকমেলন গাছে লেদাপোকা আক্রমণ করে পাতা ও লতা

> জমি থেকে তিনি ১৭০ কেজি রকমেলন উৎপন্ন করে তা পাইকারি বাজারে ১০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৭ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। এতে তার উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা লাভ হয়েছে

খেয়ে ফেলে। ভলিয়াম ফ্লেক্সি-৩০ এসসি নামক কীটনাশক (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি. হারে) গাছে নিয়মিত স্প্রে করে এ পোকা দমন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এভাবে কৃষক ক্ষিতিষ বৈরাগী রকমেলন চারাগুলোর পরম যত্ন করেছেন। এতে চারাগুলো ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে লতিয়ে যায়। গাছ বা লতা ২ হাত লম্বা হলে তা ঘেরের পাড়ে তৈরি মাচায় তুলে দিতে হবে। এতে গাছ মাচায় লতিয়ে বা ছড়িয়ে পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পারে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর গাছে ফুল এবং ৪০-৪৫ দিন পর ফল ধরা শুরু হয়। আর ৬৫-৭০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা হয়। ক্ষিতিষ বৈরাগী বলেন, প্রতি গাছে ৫-৬টি ফল ধরেছে এবং এক একটি ফলের ওজন হয়েছে গড়ে ১-৩ কেজি। ফল বড় হওয়া শুরু হলে যাতে ছিঁড়ে না পড়ে সেজন্য তা থলের মতো নেটের ব্যাগ দিয়ে মাচার সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তার জমিতে উৎপন্ন অধিকাংশ ফল দেখতে ঘিয়ে রঙের গোলাকার এবং ভেতরের শাঁস হালকা হলুদ, অনেকটা আমাদের দেশীয় ফল বাঙ্গির মতো। এফল খেতে বেশ সুস্বাদু, মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত। ঘেরের পাড়ের ১০ শতক জমিতে রকমেলন চাষে বীজ, মাদা তৈরি, সার, মাচা তৈরি, শ্রমিক ও কীটনাশক বাবদ তার মাত্র ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বীজ বপনের দুই মাস পর থেকে তিনি ফল বিক্রি শুরু করেন। এ জমি থেকে তিনি ১৭০ কেজি রকমেলন উৎপন্ন করে তা পাইকারি বাজারে ১০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৭ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। এতে তার উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা লাভ হয়েছে বলে তিনি জানান। উপরন্তু তিনি ২ হাজার টাকার বীজ বিক্রি করেছেন। রকমেলনের ভালো ফলন ও দাম পেয়ে খুশিতে ভরে উঠছে কৃষক ক্ষিতিষের মন।

রূপসা উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ ফরিদুজ্জামান বলেন, ক্ষিতিষ বৈরাগী একজন উদ্যমী চাষি। তিনি উপজেলায় প্রথম নতুন ফসল রকমেলন চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন। তার ক্ষেত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তার এ সফলতা দেখে এলাকার আরো অনেক চাষি এ ফল চাষে আগ্রহী হয়েছেন। ক্ষিতিষ বৈরাগী ছাড়াও ডোবা গ্রামের তন্ময় ও শ্যামল, গোয়াড়ার অংশু ও বলটি গ্রামের দীপ এ বছর প্রথম মৎস্য ঘেরের পাড়ে রকমেলন চাষ করেছেন। রকমেলন একটি লাভজনক ফসল। তাই আগামী বছর উপজেলায় এ ফসলের চাষ আরো বাড়বে বলে তিনি আশা করেন।

নানা রঙের রকমেলন ফল দেখা যায়। একটি ঘিয়ে রঙের গোলাকার, ভেতরের শাঁস হালকা হলুদ অনেকটা দেশীয় ফল বাঙ্গির মতো। আরেকটি বাদামি রঙের ধূসর, খোসা খসখসে ওপরে জাল-জাল দাগ থাকে। এর ভেতরের খাদ্য অংশ গাঢ় হলুদ। অন্য আরেকটি ফল দেখতে হালকা সবুজ রঙের গোলাকার। খোসা খসখসে গায়ে জাল জাল দাগ আছে। এর ভেতরের শাঁসও গাঢ় হলুদ। রঙ ও আকৃতি যেমনই হোক, সব রকমের ফলই পুষ্টিকর, খেতে সুস্বাদু, মিষ্টি ও সুগন্ধ যুক্ত।

রকমেলন ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি এবং ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও জিংক রয়েছে। এতে থাকা ভিটামিন এ, সি এবং বিটা-ক্যারোটিন চোখের দৃষ্টিশক্তি ও ত্বককে ভালো রাখে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আঁশ সমৃদ্ধ শর্করা থাকায় এ ফল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তে দেয় না। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। রকমেলনে থাকা পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভালো কাজ করে। তাছাড়া এ ফলে জিংক আছে। দেহ কোষের গঠন ও বৃদ্ধিতে জিংক সহায়তা করে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জিংকের খুব প্রয়োজন। মুখের রুচি বাড়াতেও এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

রকমেলন খুব রসালো ফল। এতে শতকরা ৯৫ ভাগ জলীয় অংশ থাকায় এটি মানব দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। এ ফল খাবারকে হজম করতে সহায়তা করে। রকমেলনে থাকা লুটেইন ও ফ্ল্যাভোনয়েডস উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। চুল ও ত্বকের জন্যও এ ফল উপকারী। তবে ডায়াবেটিক ও কিডনি রোগীদের এ ফল খাওয়ার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

বিদেশী এ ফল বর্তমানে বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিয়েছে। তাই আমাদের দেশেও এখন রকমেলন চাষ শুরু হয়েছে। এ ফলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এর বাজারমূল্যও বেশি। তাই এর চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য রকমেলন ফল চাষে কৃষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া একান্ত আবশ্যক।

লেখক : উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, রূপসা, খুলনা।
মোবাইল : ০১৯২৩৫৮৭২৫৬; ই-মেইল : rahman.rupsha@gmail.com

একজন বাবার গল্প

কৃষিবিদ স্বপন বিশ্বাস

বাবার দীর্ঘ জেল জীবন।
কিশোরী বালিকা দু'পাশে বেনী দুলিয়ে
ছোট ভাইটিকে বাবার গল্প শোনায়
ছেলেটি মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প শোনে
আর দু'চোখ জুড়ে বাবার ছবি আঁকে ।
বিশাল দেহের একটি মানুষ
তার লম্বা হাত উঁচু করে যখন কথা বলে
তখন তর্জনী গিয়ে আকাশ স্পর্শ করে।
বাবার কিছু আবছা স্মৃতি মনে পড়ে
বাবা যখন মাঝে মাঝে জেল থেকে বাড়ী ফেরে
তখন বাড়ীময় শুধু আনন্দ আর আনন্দ
পোষা পায়রাগুলো বাকুম বাকুম করে
বাড়ীতে অনেক মানুষের আনাগোনা
মা তখন নতুন নতুন খাবার রান্না করে।
বাবা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে
বালিকাটি বাবার কাছে কাছে ঘুরঘুর করে
বালকটি শিশুর ঈর্ষা নিয়ে দূর থেকে দেখে।
আবার নিরুদ্দেশ, জেলে ফিরে যাওয়া।
একবার জেলের বারান্দায়
বালিকা হাঁটছে সামনে, বালক পিছনে,
বাবার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে
হঠাৎ বালক জামা ধরে টান দিল বালিকার-
তোমার বাবাকে কি আমি বাবা বলে ডাকতে পারি?
বালিকার বুকে তখন জোয়ারের জল
ছলাৎ ছলাৎ ছল
ঠোঁট কেঁপে ওঠে, চোখে জল তার ছল ছল-
এ প্রশ্ন কেন? সে তো তোমারও বাবা!
বালকের সকল উৎকণ্ঠা বেদনা ও ভালোবাসা
কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে আসে

এক অস্ফুট শব্দ- যে নামে পুত্র পিতাকে ডাকে।
পিতার বিশাল বুকে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়
প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে হিমালয় থেকে সুন্দরবন
প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে পদ্মা মেঘনা থেকে বঙ্গোসাগর
প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয় প্রতিটি মানুষের বুকে।
জন্ম হয় একটি জাতির।
তিনি হয়ে ওঠেন বালকের পিতা থেকে জাতির পিতা।
ফুলের বাগানে যেমন সাপ শুয়ে থাকে
তেমনি মানুষের মাঝে বাস করে কিছু
হিংস্র জন্তু জানোয়ার- যাদেরকে অমানুষ বলে।
কিছু অমানুষ খুন করেছে সেই বালককে-
খুন করেছে জাতির পিতাকে।
সেই কিশোরী বালিকা এখনও পিতার স্বপ্ন আঁকে
ছবি আঁকে আমাদের হৃদয়ের ক্যানভাসে
সে ছবির নাম- আমার সোনার বাংলা।

লেখক : কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন,
জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জামাইকা, নিউইয়র্ক।
ই-মেইল : swapan64@gmail.com

ভাদ্র মাসের তথ্য ও প্রযুক্তি পাতা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

আমন ধান

- আমন ধানের ক্ষেতে আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- আমন ধানের জন্য প্রতি একর জমিতে ৮০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয়। এ সার তিন ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পর, দ্বিতীয় ভাগ ৩০-৪০ দিন পর এবং তৃতীয় ভাগ ৫০-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনো আমন ধান রোপণ করা যাবে। দেরিতে রোপণের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত ধান বেশ উপযোগী।

দেরিতে চারা রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫-৭টি চারা দিয়ে ঘন করে রোপণ করুন।

- নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন।

পাট

- বীজ উৎপাদনের জন্য ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত দেশী পাট এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বোনা যায়।
- বন্যার পানি উঠেনা এমন সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে জো বুঝে প্রতি শতাংশে লাইনে বুনলে ১০ গ্রাম আর ছিটিয়ে বুনলে ১৬ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। জমি তৈরির সময় শেষ চাষে শতকপ্রতি ২৭০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০ গ্রাম টিএসপি, ১৬০ গ্রাম এমওপি সার দিন। পরবর্তীতে শতাংশপ্রতি ইউরিয়া ২৭০ গ্রাম করে দুই কিস্তিতে বীজ বপনের ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৪৫ দিন পর জমিতে উপরিপ্রয়োগ করুন।

আখ

- এসময় আখ ফসলে লালপচা রোগ দেখা দিতে পারে। লালপচা রোগের আক্রমন হলে আখের কাণ্ড পচে যায় এবং হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। এজন্য আক্রান্ত আখ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন এবং জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখুন।

তুলা

- ভাদ্র মাসের প্রথম দিকেই তুলার বীজ বপন কাজ শেষ করুন।
- বৃষ্টির ফাঁকে জমির জো অবস্থা বুঝে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে বিঘাপ্রতি প্রায় ২ কেজি তুলা বীজ বপন করুন। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৬০-৯০ সেন্টিমিটার এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার বজায় রাখুন।
- তুলার বীজ বপনের সময় খুব সীমিত। হাতে সময় না থাকলে জমি চাষ না দিয়ে নিড়ানি বা আগাছা নাশক প্রয়োগ করে ডিবলিং পদ্ধতিতে বীজ বপন করুন। বীজ গজানোর পর কোদাল দিয়ে সারির মাঝখানের মাটি আলগা করে দিন।
- সমতল এলাকার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাত যেমন সিবি১৬, সিবি১৭, সিবি১৮, সিডিবি তুলা এম-১, সিবি হাইব্রিড-১ আবাদ করুন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ি তুলা-১ এবং পাহাড়ি তুলা-২ নামে উচ্চফলনশীল জাতের তুলা চাষ করুন।

শাকসবজি

- ভাদ্র মাসে লাউ ও শিমের বীজ বপন করা যায়। এজন্য ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৭৫ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সেমি. গভীর করে মাদা বা গর্ত তৈরি করুন।
- প্রতি মাদায় ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করুন।
- মাদা তৈরি হলে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনে দিতে হবে এবং চারা গজানোর ২-৩ সপ্তাহ পর দুই-তিন কিস্তিতে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫ গ্রাম এমওপি সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এসময় আগাম শীতকালীন সবজি চারা উৎপাদনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। সবজি চারা উৎপাদনের জন্য উঁচু এবং আলো বাতাস লাগে এমন জায়গা নির্বাচন করুন।

এক মিটার চওড়া এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে বীজতলা করে সেখানে উন্নত জাতের ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো এসবের বীজ বুনন।

গাছপালা

- ভাদ্র মাসেও ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ করুন।
- বন্যায় বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন।
- এবছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দিন, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেঁটে দিন।
- ভাদ্র মাসে আম, কাঁঠাল, লিচু গাছ ছেঁটে দিন। ফলের বোঁটা, গাছের ছোট ডালপালা, রোগাক্রান্ত অংশ ছেটে দিলে পরের বছর বেশি করে ফল ধরে এবং ফলগাছে রোগও কম হয়।

বিবিধ

- উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ করুন, অধিক লাভবান হন।
- স্বল্পকালীন ও উচ্চফলনশীল জাত নির্বাচন করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন।
- শ্রম, সময় ও খরচ সাশ্রয়ে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের মাধ্যমে আবাদ করুন।

লেখক : তথ্য অফিসার (কৃষি), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১১০১৯৬১০, ই-মেইল : manzur_1980@yahoo.com

প্রশ্নোত্তর

কৃষিবিদ মোঃ আবু জাফর আল মুনছুর

নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য আপনার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন।

মো. মেহেদী হাসান, উপজেলা : পত্নীতলা, জেলা : নওগাঁ।

প্রশ্ন : পান গাছে গোড়া পঁচা রোগ হয়েছে, করণীয় কী?

উত্তর : আক্রান্ত লতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। বরজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সরিষার খৈলের সাথে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। রোগ দেখা দিলে ম্যানকোজেব/রিডোমিল গোল্ড ২ গ্রাম/লিটার হারে ১০-১২ অন্তর স্প্রে করতে হবে।

মো. রিয়াজুল ইসলাম, উপজেলা : ফুলবাড়ি, জেলা : দিনাজপুর।

প্রশ্ন : ডালিমের গায়ে কালো বিক্ষিপ্ত ক্ষত দাগ হয়, প্রতিকার কী?

উত্তর : গাছের নিচে ঝড়ে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে। ফল মটরশুটির আকার হওয়ার পর থেকে ১ গ্রাম/লিটার পানিতে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার ব্যবহার করতে হবে।

মো: সুজন, উপজেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

প্রশ্ন : পরিপক্ক পেয়ারা ফলের ভেতর লেদাপোকা দেখা যাচ্ছে, করণীয় কী?

উত্তর : ফল ব্যাগিং করতে হবে। ১০০ গ্রাম থেতলানো কলা+৫ গ্রাম কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক+১০০ মিলি পানি মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। ডাইমেথয়েট গ্রুপের কীটনাশক ২মিলি/লিটার হারে ব্যবহার করতে হবে।

মো. মেহেদী হাসান, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ।

প্রশ্ন : লাউ গাছের পাতাতে হলুদ এবং সাদা দাগ পড়লে কোন রোগ হয় এবং এর জন্য করণীয় কী?

উত্তর : ডাউনিমিলডিউ রোগ হতে পারে। *Pseudoperonospora cubensis* ছত্রাকের কারণে হয়। এ রোগ প্রতিরোধে রোগ প্রতিরোধ জাত ব্যবহার; সুষম সার ব্যবহার; টিল্ট-২৫০ ইসি-০.৫ মিলি/লিটার; আক্রমণ বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি সালফার গুঁড়া ক্ষেতের গাছে ছিটিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

তরিকুল ইসলাম, উপজেলা : দিনাজপুর, জেলা : দিনাজপুর।

প্রশ্ন : আমন ধানের সারের পরিমাণ।

উত্তর : বিঘাপ্রতি ইউরিয়া-২৬ কেজি, টিএসপি-৮ কেজি, এমওপি-১৪ কেজি, জিপসাম-৯ কেজি। ইউরিয়া ৩ ভাগের ১ ভাগ এবং বাকি অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় দিতে হবে এবং ১ ভাগ গাছ লাগানোর ১৫-২০ দিন পর এবং বাকি ১ ভাগ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে।

মো. জব্বার হোসেন, উপজেলা : সদর, জেলা : নরসিংদী।

প্রশ্ন : আমন ধানের উৎপাদন কিভাবে বাড়াবো?

উত্তর : ১. মাটি ব্যবস্থাপনা (উর্বর, সমতল ও উপযুক্ত গভীরতায় কর্ষন); ২. মানসম্মত বীজ বাছাই; ৩. বীজতলার সঠিক পরিচর্যা; ৪. চারা ২৫-৩০ দিনে তোলা ও দ্রুততার সাথে রোপণ করা; ৫. উন্নত সার ব্যবস্থাপনা; ৬. ৪০ দিন পর্যন্ত জমি সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত রাখা; ৭. বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ও উপযুক্ত সময়ে কর্তন।

মো. ইয়াকুব মোল্লা, উপজেলা : মোল্লারহাট, জেলা : বাগেরহাট।

প্রশ্ন : ধান রোপণের ১ মাস পর লবণাক্ততার সমস্যা। করণীয় কী?

উত্তর : জমিতে পানি বেঁধে রাখতে হবে। মিষ্টি পানির সেচ/বৃষ্টি হলে তা আটকে রাখা। লবণ পানির প্রবেশ ঠেকাতে হবে। লবণসহিষ্ণু জাতের ধান (ব্রি ধান৫৩/ব্রি ধান৫৪/ব্রিধান৫৫ /ব্রি ধান৭৮/ব্রি ধান৬৭) চাষ করা।

মো. মামুন হোসেন, উপজেলা : দুর্গাপুর, জেলা : রাজশাহী।

প্রশ্ন : পাটের পচন পদ্ধতি কী?

উত্তর : পানির যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে ডোবা/খাল/সামান্য স্রোত থাকে এমন নদীতে তাড়াতাড়িভাবে জাগ দিয়ে পাট পচানো যায়। তবে পানির স্বল্পতা থাকলে কাঁচা পাটের ছাল ছাড়িয়ে বেড়ীর ন্যায় বেধে/রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানো যায়।

মো. মাসুদ রানা, উপজেলা : সদর, জেলা : টাংগাইল।

প্রশ্ন : পুঁইশাকের পাতায় লালচে রঙের ছোট ছোট দাগ হয়। পরবর্তীতে করণীয় কী?

উত্তর : রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক বিকেলে প্রতি ৭ দিন পরপর এভাবে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। পাশাপাশি সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রান্ত পাতাগুলো তুলে নষ্ট বা পুড়ে ফেলতে হবে।

মো. আজগর আলী, উপজেলা : ঘিওর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

প্রশ্ন : নারিকেল বাড রট হলে করণীয় কী?

উত্তর : আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানিতে কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। বর্দোমিকচার (১%) মিশিয়ে স্প্রে করা এবং আক্রান্ত নারিকেল সংগ্রহ করে পুঁতে ফেলতে হবে।

লেখক : তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৪১০৪৮৫৩; ই-মেইল : iopp@ais.gov.bd

আশ্বিন মাসের কৃষি

(১৬ সেপ্টেম্বর - ১৬ অক্টোবর)

কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম

আশ্বিন মাস। এ মাসে গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বর্ষাকালের অবিরাম বর্ষণ। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে কচি ধানের হেলেদুলে কাটানো কৈশর। শুভ্র কাশফুল আর সুনীল আকাশের সাদা মেঘ। প্রকৃতি হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও মনোরম। এ মাসের শেষে বৃক্ষরাজির সবুজপাতা আর বৈচিত্র্যময় মাটি ভিজিয়ে দেয় স্বচ্ছ শিশির। প্রকৃতির এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা জেনে নেই আশ্বিন মাসের বৃহত্তর কৃষি ভুবনের করণীয় বিষয়গুলো।

আমন ধান

আমন ধানের বয়স ৪০-৫০ দিন হলে ইউরিয়ার শেষ কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। এ সময় বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিতে পারে। সে জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফিতাপাইপের মাধ্যমে সম্পূরক সেচ দিলে পানির অপচয় অনেক কম হয়। শিষ কাটা লেদাপোকা ধানের জমি আক্রমণ করতে পারে। প্রতি বর্গমিটার আমন জমিতে ২-৫টি লেদা পোকার উপস্থিতি মারাত্মক ক্ষতির পূর্বাভাস। তাই সতর্ক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় মাজরা, পামরি, চুঙ্গী, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খোলপোড়া, পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। সঠিক রোগ শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

নাবি আমন রোপণ

কোন কারণে আমন সময়মতো চাষ করতে না পারলে অথবা নিচু এলাকায় আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান৪৬, বিনাশাইল বা স্থানীয় জাতের চারা রোপণ করা যায়। গুছিতে ৫-৭টি চারা রোপণ করতে হবে। অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি ইউরিয়া প্রয়োগ ও অতিরিক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় এবং দেরির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়।

তুলা

এ সময় তুলাক্ষেতে গাছের বয়স ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। গোড়ার সবচেয়ে নিচের ১-২টি অঙ্গজ শাখা কেটে দেয়া ভালো। লাগাতার বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাসের কারণে গাছ হেলে পড়লে পানি নিষ্কাশনসহ হেলে যাওয়া গাছ সোজা করে গোড়ায় মাটি চেপে দিতে হবে। ইউরিয়া, এমওপি ও বোরনসহ অন্যান্য অনুখাদ্য নিয়মিতভাবে পাতায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ সময় রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা গেলে সঠিক বালাই শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাট

নাবি পাট ফসল উৎপাদনে এ সময় গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সমান রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার ১৫-২০ দিনে এবং তৃতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার ৪০-৪৫ দিনে প্রয়োগের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। এ সময় সবজি ও ফল বাগানে সাথী ফসল হিসেবে বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

আখ

আখের চারা উৎপাদন করার উপযুক্ত সময় এখন। সাধারণত বীজতলা পদ্ধতি এবং পলিব্যাগ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হলে বীজ আখ কম লাগে এবং চারার মৃত্যুহার কম হয়। চারা তৈরি করে বাড়ির আঙ্গিনায় সুবিধাজনক স্থানে সারি করে রেখে খড় বা শুকনো আখের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। চারার বয়স ১-২ মাস হলে মূল জমিতে রোপণ করা উচিত। কাটুই বা অন্য পোকা যেন চারার ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিনা চাষে ফসল আবাদ

মাঠ থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বিনা চাষে অনেক ফসল আবাদ করা যায়। ভুট্টা, গম, আলু, সরিষা, মাসকালাই বা অন্যান্য ডাল ফসল, লালশাক, পালংশাক, ডাঁটাশাক বিনা চাষে লাভজনকভাবে আবাদ করা যায়। সঠিক পরিমাণ বীজ, সামান্য পরিমাণ সার এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে লাভ হবে অনেক। যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্পমেয়াদি সরিষা জাত (বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭, বারি সরিষা-১৮, বিনা সরিষা-৪, বিনা সরিষা-৯, বিনা সরিষা-১০ ইত্যাদি) চাষ করতে পারেন।

শাকসবজি

আগাম শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উঁচু জায়গা কুপিয়ে পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে শাক উৎপাদন করা যায় যেমন– মুলা, লালশাক, পালংশাক, চীনাশাক, সরিষাশাক অনায়াসে করা যায়। সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম,

টমেটো, বেগুন, ব্রোকলি বা সবুজ ফুলকপিসহ অন্যান্য শীতকালীন সবজির চারা তৈরি করে মূল জমিতে বিশেষ যত্নে আবাদ করা যায়।

কলা

অন্যান্য সময়ের থেকে আশ্বিন মাসে কলার চারা রোপণ করা সবচেয়ে বেশি লাভজনক। এতে ১০-১১ মাসে কলার ছড়া কাটা যায়। ভালো উৎস বা বিশ্বস্ত কৃষক-কৃষানির কাছ থেকে কলার অসি চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে। কলার চারা রোপণের জন্য ২-২.৫ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সেমি. গভীর গর্ত করে রোপণ করতে হবে। গর্ত প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর, ১২৫ গ্রাম করে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার এবং ৫ গ্রাম বরিক এসিড মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫-৭ দিন পর অসি চারা রোপণ করতে হবে। কলাবাগানে সাথী ফসল হিসেবে ধান, গম, ভুট্টা ছাড়া যে কোন রবি ফসল চাষ করা যায়। সরকারিভাবে মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে জি-৯ কলার টিসু কালচার চারার উৎপাদন ও বিক্রি হচ্ছে। এ জাতের কলার ফলন অন্য জাতের চেয়ে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি, সুস্বাদু ও রোগ প্রতিরোধী। মাত্র ৮-৯ মাসের মধ্যে কলা পাওয়া যায়।

গাছপালা

বর্ষায় রোপণ করা চারা কোনো কারণে নষ্ট হলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুঁটি সরিয়ে দিতে হবে এবং চারার চারদিকের বেড়া প্রয়োজনে সরিয়ে বড় করে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। চারা গাছসহ অন্যান্য গাছে সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এখনই। গাছের গোড়ার মাটি ভালো করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। দুপুর বেলা গাছের ছায়া যতটুকু স্থানে পড়ে ঠিক ততটুকু স্থান কোপাতে হবে। পরে কোপানো স্থানে জৈব ও রাসায়নিক সার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

প্রাণিসম্পদ

হাঁস-মুরগির কলেরা, ককসিডিয়া, রানীক্ষেত রোগের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে টিকা প্রদান, প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়ানোসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। এ মাসে হাঁস-মুরগির বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। বাচ্চা ফুটানোর জন্য অতিরিক্ত ডিম দেয়া যাবে না। তা ছাড়া ডিম ফুটানো মুরগির জন্য অতিরিক্ত বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আশ্বিন মাসে গবাদিপশুকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো দরকার। গবাদি পশুকে খোলা জায়গায় না রেখে রাতে ঘরের ভেতরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পানিতে জন্মানো গোখাদ্য এককভাবে না খাইয়ে শুকিয়ে খরের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এ সময় ভুট্টা, মাসকলাই, খেসারি বুনো ঘাস উৎপাদন করে গবাদিপশুকে খাওয়াতে পারেন। গর্ভবতী গাভী, সদ্য ভূমিষ্ঠ বাছুর ও দুধালো গাভীর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময় গবাদি প্রাণীর মড়ক দেখা দিতে পারে। তাই গবাদিপশুকে তড়কা, গলাফুলা, ওলান ফুলা রোগের জন্য প্রতিষেধক, প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চত করতে হবে।

মৎস্যসম্পদ

বর্ষায় পুকুরে জন্মানো আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং পুকুরের পাড় ভালো করে বেঁধে দেয়া প্রয়োজন। পুকুরের মাছকে নিয়মিত পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা দরকার। এ সময় পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া পুকুরে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রোগ সারাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি মাছের খামার থেকে জিওল মাছের পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

আশ্বিন মাসে নিয়মিত কৃষি কাজের পাশাপাশি সারা দেশজুড়ে ইঁদুর নিধন অভিযান শুরু হয়। খাদ্য নিরাপত্তায় ইঁদুরের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য এ অভিযান খুবই জরুরি। এককভাবে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ইঁদুর দমন করলে কোন লাভ হবে না। ইঁদুর দমন কাজটি করতে হবে দেশের জনগণকে একসাথে মিলে এবং ইঁদুর দমনের বৈজ্ঞানিক সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আসুন সবাই একসাথে ইঁদুর দমন করি। সবাই ভালো থাকি।

সম্পাদক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
টেলিফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪; ই-মেইল : editor@ais.gov.bd.

সংশোধনী

কৃষিকথা শ্রাবণ ১৪২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত রিবন রেটিং পদ্ধতি : স্বল্প পানি এলাকায় পাট পচানোর জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রবন্ধে পৃষ্ঠা নং ১৮, ৩৩টি রিবনারের স্থলে ৩৩০০০টি রিবনার এবং পৃষ্ঠা নং ২২ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লেখক পরিচিতিতে ময়মনসিংহের স্থলে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর হবে।

কৃতসা, অফসেট মুদ্রণ, ২৭ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১২ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ৬৩, ৪০০ কপি।